ফরিদপুর জেলা

স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারিনি

১৯৭১ সালে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন আমি এ গায়ের বউ। আমার স্বামী জেলে। আমার দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে। একদিন ভোর রাতে মিলিটারি হানা দেয় এই গ্রামে। তখন কেউ ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মাঠে কাজ করতে বেরিয়েছিল। মিলিটারি সব বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে। পাশের বাড়ির সকলে পালিয়ে গেল ভারতে। আমাকেও বলেছিল আমার স্বামী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কারও সাথে ভারতে চলে যেতে। কিন্তু আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারিনি। আমাদের নিয়ে যখন কোনো নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য রাস্তায় নামে তখন আমার স্বামীর ছোট ভাই তাকে বলে, মিলিটারিরা আমাদের মারবে না। এই বলে আমাদের বাড়ি নিয়ে যায়। তখন মিলিটারি তাদের দুই ভাইকে গুলি করে হত্যা করে। আমিও বলেছিলাম আমাকে গুলি করতে। কিন্তু আমার শাশুড়ি আমাকে নিয়ে আসে। বলে, তুমিও যদি মরে যাও তবে এই ছোট শিশুদের কী হবে। তখন আমি কী করব? কোথায় যাব? কী খাওয়াব আমার সন্তানদের। তখন আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রওয়ানা হলাম ভারতের দিকে। কিন্তু অর্ধেক পথে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। চলে গেলাম আমার বাপের বাড়ি। সেখানে আমার কেউ নেই। ক্ষিধের কষ্টে আমার শাশুড়ি মারা গেল।

আমাদের পাশের বাড়ি আমার এক ননদ ছিল। তার এক মেয়ে না খেতে পেয়ে মারা গেছে। আর এক ছেলেকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছে। সে তখন গর্ভবতী। পরার মতো কাপড় ছিল না তার। ছালা গায়ে জড়িয়ে জল আনতে যেত। আমাদের বাড়ির পাশের এক নতুন বউ সবাইকে হারিয়ে অজানা অচেনা পথে চলতে গিয়ে তাকে মরতে হয়।

আমাদের বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে এক বাড়িতে মুক্তিবাহিনী খেতে এসেছিল। তারা খাবার খেতে বসলে একটি প্লেন ওই বাড়ির উপর দিয়ে যায়। তারা ভাবে তাদের খবর হয়ত ওরা জেনে গিয়েছে। তখন যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। পরে প্লেন চলে গেলে তারা এসে খেয়ে যায়।

যুদ্ধ শেষ হল। দেশে শান্তি ফিরে এল।

সূত্র : জ- ৫৮১২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নূপুর বিশ্বাস	**নিহার বালা**
আলফাডাঙ্গা এ জেড বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: আলফাডাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
নবম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা	বয়স: ৭৬ বছর, সম্পর্ক: ঠাকুরমা

এখন পারি যদি আবার লাগি

আমি মো. খলিলুর রহমান। আমার জন্ম ১৯৪৯ সালে। বর্তমানে আমার বয়স চলিতেছে ৬৪ বছর ৭ মাস। আমি দিগনগর আলীয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করিতাম। আমার লজিং ছিল বর্নী গ্রামে। ৯ম ক্লাসে পড়াশোনা করি। বাবা গরিব লোক, আমাকে খুব আদর করিতেন। সেহেতু দুই দিনের ছুটি নিয়া বাড়িতে আসিলাম। পরদিন শুক্রবার। শুনিলাম পাকবাহিনী আসিয়াছে। ভয়েতে কোথায় যাই। ঠাসঠুস শব্দ শোনা যায়। সিঅ্যান্ডবি রাস্তা দিয়ে খাকি রঙের গাড়িতে

পাকসেনারা ভাঙ্গা যায়। পরদিন ভোর রাতে শুনিতে পাই যে, জানদি বাইনাবাজার ঘিরিয়াছে পাকবাহিনী। শুনিয়া সকালে ওইখানে গেলাম। খুব একটা ভয়, কোনোদিন মিলিটারি দেখি নাই। আড়ালে থাকিয়া দেখি বেশ কিছু লোক নদী পার হইল। শোনা যায় অনেক লোক গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। পরে ওইখানে যাইয়া দেখি ১৯ জন পাকসেনা পোদ্দার বাড়িতে এদিক ওদিক চলাফেরা করিতেছে। আমাকে দেখিয়া আমার বাম হাত ধরিয়া বলে, তুমি কি আচ্ছা মুসলিম হায়? আমি জবাব দিলাম, হাম মুসলিম হায়। দুঃখের বিষয় তখন ছিলাম আমি উর্দুর জাহাজ। পোদ্দার বাড়ির আশপাশে যে হিন্দু ছিল তাদের ১৫ জনকে সাদা ধুতি দিয়া হাতে বাঁধিয়া সিনা সোজা গুলি করিয়াছে। চাহিয়া দেখি কী অবস্থা! মন খারাপ লাগে। আনাচে কানাচে লোক মরা। বাজারের পূর্ব পাশে অনেককে মারিয়া ফেলিয়াছে তাহাও দেখিলাম। আমি দেখি ওদের গা ভরা সরঞ্জাম। এখন চিনি সেইগুলি কী? ওরা আমাকে ভাঙ্গা নিয়া গেল। ওপার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখিয়া আমাকে দিয়া ভাত পাকাইয়া খায়, আমাকে দিল না। একেবারে সারা দিন কিছুই খাই নাই, ওরা খায় আমাকে দেয় না। দুঃখের বিষয় ভয়ে তখন আমার কেমন যেন লাগিয়াছিল। পায় ছিল কেয়ারআই জুতা। আমার শরীরের ঘামে জুতা পানিতে ভরে গেল। মাগরিবের নামাজের পর আমাকে ছাড়িয়া দিল। বড় চক ২ নং পোলের কাছে আসিয়া সিদা জানদী হইয়া বাড়ি আসিয়া বেঁহুশ হইয়া পড়ি। পরে পানি ঢালিয়া হুঁশ করিয়া মা আমাকে বলে, তোকে কি মেরেছে? মাগো মা আমাকে মারেনি। পরদিন সকাল ৭টা ৩০ মিনিটের সময় বাড়ি হইতে হাঁটিয়া ভাঙ্গার ওপার হাসপাতালে যাই। ওই রাস্তায় কাপুড়িয়া সদরদী হইয়া বর্নী তাজিন বাড়িতে যাইয়া শুনি পাকবাহিনী ভাঙ্গা যায় আর টেকেরহাট যায়। ওই সময় মাদ্রাসা খোলা, ক্লাস ঠিকমত চলে। পরদিন রবিবার মাদ্রাসায় যাইয়া লেখাপড়া করিলাম। ছুটির পর নদী পার হইয়া খানজাপুর হইয়া বাড়ি আসিতেছি। বামদিকে দেখি খাকি রংঙের ৮ জন সব বরইতলে। ওই সময় বাম রোডের পাশে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময় একজন মিলিটারি আমাকে বলে, হে মৌলভী সাব, কাহাগিয়া তোম? হামারা গাড়হি কো আন্দার জলদি আয়া, তুমি লোক মেরা দোস্ত হায়, তুমি লোক ভোট কিদারে দিজিয়ে। জয়বাংলা না পাকিস্তান মে, ভোট দি ছাকতা হায়? আমি ভয়তে জোরছে বলি, ছাহেব ভোট দিজিয়ে পাকিস্তান মে। ঠিক হায় তোম আচ্ছা আদমি হায়। আমার হাত ধরিয়া গেল লইয়া স্ট্যান্ডে, দেখি মিলিটারির অভাব নাই, ৭০/৮০ জন হবে। আমাকে বলে তোম খোদাকা কালাম পড়। তখন আমি পড়লাম সুরা ইয়াসিন। আমার মনে হইল ১০০-র ভিতর ৯৫টা ভুল। ভয়তে কাঁপিতেছি, কী পড়িব কিছুই মনে নাই। ওরা সবাই হাসাহাসি করিতেছে। আমাকে চিকন একজন মিলিটারি নানান কথা উর্দুতে বলে। ওদের শরীরে বোটকা গন্ধ, খুবই খারাপ। আমি কোনো কথা বলি না। পরে আমাকে বলে, উস আদমি কো বোলাও। আমি চাহিয়া দেখি রাস্তার পশ্চিমে পাটের ক্ষেত নিড়ায়। আমাকে সবাই চিনে, যেহেতু এ দেশে ১০টি বৎসর হয় বসত করি। চাওচা, পদ্দোকান্দা, বাটিকমারী, কোহালদিয়া আলিপুর, পূর্বদিকে ভাজনদী, বাকসাখোলা, বেশমপদি বর্নীর মেয়ে-পুরুষ সবাই আমাকে চেনে। ওই লোকদিগকে আমি বলি, তোমরা পাট নিয়ে বাড়ি যাও। মিলিটারি আমার বাংলা কথা বুঝে না। লোকজন কিছু বাড়ি গেল আর বেশ কিছু লোক, ৬৩ জন স্ট্যান্ডে আসিল আমাকে নিয়া ৬৪ জন। আমার হাতে কোরআন শরীফ, কিতাব, বই খাতা। বরইতল ব্রিজের এপাশে ওপাশে সব লোক এক লাইনে দাঁড়া করাইল। আমাকে দিল পিছনে। দক্ষিণ মুড়া গুড়ানী বৃষ্টি হইতেছে। আমি পিছন হইতে সামনের দিকে চাহিয়া দেখি একজন পাকসৈন্য আর একজনকে কী যেন

বলিল। আমি দেখিলাম সাদা একটা রাইফেল নিয়ে লাইনের লোকের সামনে দাঁড়াইল। মিলিটারি ডানদিকে কাইত হইয়া বলিতেছে, নেস্ট ম্যান লেপ হুইল টু কোলজ মারচ– এ কথা আমার কানে শুনতে পাইলাম। ওই বেটা আবার ওই কথা বলিল। তখন চেয়ে দেখি আমার পিছনে কোনো লোক নেই। এখন আমি বাম দিকে দুই কদম সরিতেই গুড়ুম করিয়া শব্দ হইলো। আমি দেখি গুলিতে ৬৩ জন লোক মরিয়া গিয়াছে। পরে আমাকে রাইফেলের বাট দিয়া পিটাইল। আমার মাড়ির ৪টা দাঁত ভাঙিয়া ফেলে এবং লাথি দিয়া পশ্চিমমুড়া রাস্তার খাদে ফেলিয়া দিল। কিছু সময় পড়ে রইলাম। তারা সরে গেলে অনেক লোকজন আসিয়া দেখিতে পায় যে, আশেপাশে ৬৩ জন লোক গুলিতে মৃত ।

আমাকে পাইল পানিতে ভাসা, মরি নাই। লোকজন আমাকে কাঁধে করিয়া বর্নী নিয়া গেল। গালভরা রক্ত ধুইয়া মুইছা দিল। ডাক্তার ছিল পঞ্চলাল, সে আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। আমি ভালো হইয়া দুই দিন পরে ঐ দেশীয় ১৩ জন ছাত্র লইয়া রওয়ানা করিলাম ভারতে। নাম ১. বাবু, ২. ইয়াদ আলী, ৩. টুকু আরও অনেক মোট ১৩ জন। চাঁনদেরহাট যাইয়া দেখি মিলিটারি। না খাইয়া ঝোপের ভিতর পালাইয়া সারা দিন থাকি। রাত ১১টায় খবর পাইলাম লাইনে পাকসেনা নাই। তখন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি, বড় বড় কচুর পাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় বের হইলাম। বামে ও ডানে পানি। রাস্তা দিয়া দৌড় আর দৌড়। কালীগঞ্জের রাস্তা দিয়া ৫ দিন হাঁটিয়া বর্ডার পার হইয়া বনগাঁও যাই। ওখান হইতে বাসে তালপাড়া যাই। দেখি যে হাজার হাজার লোক, খাওয়া-দাওয়ার খুবই কষ্ট। যেহেতু পিটি প্যারেড করিলাম, বেশ কিছুদিন পরে বাছাই করিয়া নিল পুরা ঠিকানাসহ।

মোকসুদপুরের রশিদ এমপি আমার অবস্থা দেখিয়া সরাসরি বীরভূম জেলা চাকলিয়া ট্রেনিং সেন্টার, ওখানে পাঠাইয়া দিল। ওখানে ট্রেনিং করিতে শুরু করিলাম। ২৯ দিনের ট্রেনিং শেষ হইলো। রাইফেল, এলএমজি, এসএলআর ইত্যাদি নিয়া সাতক্ষীরা বর্ডার দিয়া প্রথম যুদ্ধ করি বাঁশবাড়িয়া। ২য় যুদ্ধ দুবলারচর, বোয়ালমারী হইয়া যুদ্ধে রাজবাড়ী পর্যন্ত গিয়া ঘোষণা শুনিতে পাইলাম দেশ স্বাধীন। ফ্ল্যাগ উড়াইয়া দিয়েছে। রাজবাড়ি হইতে বাসে ফরিদপুর ঈশান স্কুল, জজ কোর্টের পাশে আসিলাম। ওই স্কুলে থাকার ৩ দিন পর অর্ডার হইলো যার যার হাতিয়ার জমা দাও। তখন সার্কিট হাউজে আমার হাতিয়ার জমা দিলাম। আমার রাইফেল নং ণ ৫৮৮৪। বর্তমানে আমি ভাতা পাই, সরকারি সার্টিফিকেট আছে। আগের কিছু কথা পরে বলিতেছি।

আমার ওস্তাদের নাম টি এন নায়েক। ৮ নং সেক্টরে আমি প্রশিক্ষণ নিয়াছি। সেক্টর কমান্ডার ছিল মেজর মঞ্জুর। ওবায়দুর রহমানকে দেখিয়াছি। আমার হাতে একটা গ্রেনেড ছিল। ওই গ্রেনেড সাতক্ষীরা বর্ডার পার হইয়া যশোর আসিয়া এক রাজাকারের বাড়ি মারিয়াছিলাম। হ্যান্ড গ্রেনেড ৩৬ টুকরা হয়। বিশেষ আর কী লিখিব। আজ ৩৬ বৎসরের কথা আর কত মনে রাখিব। বোয়ালমারী আসিয়া অনেক মিলিটারি মেরেছি। এখন পারি যদি আবার লাগি। আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি।

সূত্র : জ-৫৩৫৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নাজমা আক্তারী	**মো. খলিলুর রহমান**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	গ্রাম: হরুপদিয়া, পোস্ট: পুখুরিয়া
ষষ্ঠ শ্রেণি, গ শাখা, রোল: ১৯	থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর

বয়স: ৬৪

সেহ্‌রি খাওয়ার জন্য জাগিয়ে তুলতেন

মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা শোনা বা লেখার জন্য ছুটে যাই পার্শ্ববর্তী জান্দী গ্রাম নিবাসী বাদল ঠাকুরের নিকট। তিনি তার দেখা ঘটনা যা বললেন তা নিম্নরূপ:

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ষোলআনা পূর্ণ করে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে জান্দী গ্রামের দুই সহস্রাধিক মানুষ বসবাস করে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে। ইতোমধ্যে কখনও কেউ কারো সাথে ভুলেও বিবাদ তো করেইনি বরং একে অপরকে সর্বদা করেছে সাহায্য সহযোগিতা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলছে তখন সারা দেশে। পাকবাহিনী হিন্দু বিদ্বেষী ছিল। সংগত কারণেই হিন্দুরা ছিল সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত। ৮ বৈশাখ রবিবার অথবা বুধবার আনুমানিক রাত তখন তিনটা, নিঝুম নিস্তব্ধ রাত। কোথাও জনমানবের পদচারণা নেই। মাঝে মধ্যে জোনাকি পোকার ঝি ঝি ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যায়। এমনি সময় জান্দী গ্রামের হিন্দুদের উপর নেমে আসে অমাবস্যার ঘনঘটা অন্ধকার। পার্শ্ববর্তী গ্রাম নওপাড়ার অধিবাসী হিন্দু বিদ্বেষী রাজাকার ডা. শহিদুল্লা কাজী ওরফে ইঙ্গুল কাজীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকবাহিনী জান্দী গ্রামের পোদ্দার বাজার সংলগ্ন সেনপাড়ার হিন্দুদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। পাকবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গ্রামবাসী এদিক সেদিক পালানোর চেষ্টা করে। পালানোর সময় পাকবাহিনী নির্বিচারে গুলি করে ৩৫ জনকে হত্যা করে। তাদের কজনের নাম নিম্নরূপ:

১। টনিক সেন, ২। নেবারূপ সেন, ৩। জীবন কৃষ্ণ সেন, ৪। মঙ্গল সেন, ৫। গেদু সেন, ৬। নিত্য গোপাল সেন, ৭। ননী গোপাল সেন, ৮। পানা সাধু সেন, ৯। শ্রেষ্ঠ সেন, ১০। সুধির সেন, ১১। কালা সেন, ১২। সমস্যা সেন, ১৩। মধু সেন, ১৪। সোনা সেন, ১৫। বাবুল সেন, ১৬। পচা সেন, ১৭। বিনয় সেন, ১৮। কালিপদ চক্রবর্তী, ১৯। নৈদা দত্ত, ২০। গুরুদাস দত্ত, ২১। গোবিন্দ চন্দ্র, ২২। মাধব দত্ত, ২৩। হেমন্ত দত্ত, ২৪। পঞ্চানন ধুপি, ২৫। অক্ষয় এবং আরও নাম না জানা অনেকে।

তাদের হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। রাত তিনটা থেকে বেলা ১০/১১টা পর্যন্ত নরপিশাচ পাকবাহিনী নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে পৈশাচিক আনন্দে মেতে থাকে। নারী পুরুষ ও শিশুর আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এরপর পাকবাহিনী হিন্দু বিদ্বেষী রাজাকার ডা. ঈঙ্গুল কাজীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হিন্দুদের তীর্থস্থান আশ্রমে প্রবেশ করে। এ সময় একজন সাধু মন্দিরে পূজারত ছিলেন। পাকবাহিনীর মেজর তাকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও তিনি কোনো সাড়া শব্দ না দিলে মেজর ক্ষিপ্ত হয়ে গুলি করার হুকুম দেয়। তারপর একজন সিপাহী তাকে গুলি করলে তিনি মারা যান। পরে পাকবাহিনী আশ্রমটি পুড়িয়ে দেয়। উল্লেখ্য, উক্ত সাধু অত্র এলাকায় একজন কামিলদার ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি রমজান মাসে মুসলমানদের সেহরি খাওয়ার জন্য জাগিয়ে তুলতেন।

সূত্র : জ-৫৪১৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শাবনাজ শাহিদী	**বাদল ঠাকুর**

ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	গ্রাম + পোস্ট: জানদী
৮ম শ্রেণি, রোল: ১	উপজেলা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর

তিনতলায় ঘুমাইতেছে আর ...

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের বেলায় বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনী। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে রেডিও সংবাদে জানতে পারি আমার দেশের মানুষের উপর তারা নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। তখন থেকেই আমার প্রতিটি রক্তের কণিকা শিউরে উঠে যুদ্ধের জন্য। কিভাবে আমার দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং বাঙালি জাতি হিসাবে বেঁচে থাকব- সেই চেষ্টার সংকল্প নিজে নিজেই গ্রহণ করি। এই স্বপ্ন নিয়ে সারাটা দিন-রাত্রি কাটাই। এভাবে আমাদের মাধবপুর গ্রামের যুবক ছেলেদের নিয়ে আমরা রাত্রি বেলায় সকলে এক স্থানে মিলিত হই এবং কীভাবে যুদ্ধে যাব, কী করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করব তা আলোচনা করি। পরে আমরা হামিরদী, পুখুরিয়া, নাজিরপুর এবং গজারিয়া গ্রামের বন্ধুদের নিয়ে রাত্রি বেলায় একত্রিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে হবে। সকলে একমত হয়ে ২০ ভাদ্র রাত্র ২ ঘটিকার সময় সকলে রেল রাস্তায় একত্রিত হই এবং সকাল ৯টার সময় রেলে উঠে কলিকাতার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। পরে কলিকাতায় গিয়ে পৌঁছলাম।

আমরা সকলে রিকশাযোগে সামসুদ্দিন ও ওবায়দুর রহমানের অফিসে হাজির হলাম। জানতে পারলাম তারা দুই জনের কেউই অফিসে নেই। অফিসে কিছু ভারতীয় লোক আছে। তারা আমাদের অফিসের কোনো স্থানে না থাকতে দিয়ে রাত্রি পার করার জন্য অফিসের সিঁড়ির তলে ২২ থেকে ২৩ জনকে রেখে ঝাঁপ আটকে দিল। পরদিন সকাল ৬টার সময় সাটারটি খুলে দেয়। এর মধ্যে আমাদের রাত্রি বেলায় কোনো কিছু খাবার দেওয়া হলো না এবং বাইরে থেকে যে কিছু খাব তারও ব্যবস্থা হলো না। পরেরদিন সকাল ৯ ঘটিকার সময় শামসুদ্দিন মোল্লা ও ওবায়দুর রহমান এসে আমাদের সকলের নাম তালিকাভুক্ত করে। আমাদের কিছু হালকা নাস্তা দিল এবং আমরা সকলে পুনরায় রেল স্টেশন হয়ে ভারতের কলিকাতা থেকে রওয়ানা দিলাম নীলগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টারের উদ্দেশে।

আমরা নীলগঞ্জ ক্যাম্পে পৌঁছলাম রাত্রি ৯টার সময় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রিক্রুটিং কাগজপত্র অফিসে জমা দেওয়ার পর ৮ নং তাম্বুতে আমাদের থাকার জন্য স্থান দিল। পরের দিন ভোর ৬টার সময় মাঠে পিটি প্যারেডের জন্য নিয়ে যায়। সকাল ৯টার সময় পিটি প্যারেড থেকে এনে একটি রুটি এবং এক মগ চা খাবার দিয়ে আবার ৯.৩০ মিনিটের সময় মাঠে নিয়ে শুরু হলো ট্রেনিং। হড়লের ডাল এবং এক বাটি ভাত দুপুরে খাবার খেয়ে পুনরায় আবার ট্রেনিং সেন্টারের মাঠে। রাত্রি বেলায় কোনো দিন দুটি রুটি দিত। কোনো দিন দেখা যেত রাত্রির রুটি সকালে খাওয়া লাগত। দুই মাস নীলগঞ্জ ট্রেনিং শেষ হলো। তারপর ওখান থেকে অস্ত্র ট্রেনিং করার জন্য একটি ব্যাচে ১৭ জন ছেলে কাগজপত্রসহ রওয়ানা দিলাম বাখুন্ডা নামক স্থানের ৯ নং সেক্টরে।

আমরা বিকাল ৫ ঘটিকার সময় বাখুন্ডা পৌঁছি। নীলগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টারের কাগজপত্র দেখানোর পরও আমাদের বাখুন্ডা ট্রেনিং সেন্টারে গ্রহণ করল না। কিছুক্ষণ পর বাঙালি একটি

লোক বরিশাল জেলায় বাড়ি, তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি সবকথা জেনে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ক্যাম্পে যদি ট্রেনিং করতে হয় তাহলে বাখুন্ডা ক্যাম্পের মধ্যে শেখ ফরিদ ও টুকু মিয়া গোপালগঞ্জের, তারা উক্ত ট্রেনিং সেন্টারে আছে তাদের সঙ্গে দেখা কর। তারা কাল সকাল ৯টায় টাকি হেডকোয়ার্টারে যাবে। তাদের সঙ্গে দেখা করব কিন্তু আমরা সকাল ৫টা থেকে সারাটা রাত্রি গাছের নিচে থাকলাম না খেয়ে। রাত্রি আনুমানিক ২ঘটিকার সময় লুৎফর নামে একজন রাত্রিকালীন প্যাট্রল ডিউটি করতে এসে আমাদের দেখতে পায় এবং আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমরা বলি, আমাদের বাড়ি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার মাধবপুর গ্রামে। ওই রাত্রিতে আমাদের ঝুড়িতে করে রুটি এবং মাংস দিয়ে খাবার দিল কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কোনো পানি আমাদের দেওয়া হলো না। কিন্তু কি আর করা, দেশের জন্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার জন্য তো কিছু কষ্ট করতেই হবে। তাই রাত্রিটি কোনো রকম পার করে অপেক্ষায় রইলাম শেখ ফরিদ ও টুকু মিয়ার জন্য।

তারা সকাল ৯ ঘটিকার সময় টাকি হেড-কোয়ার্টারের উদ্দেশে রওয়ানা করে ট্রেনিং সেন্টার হতে বের হওয়ার পর আমরা ১৭ জন ছেলে তাদের রিকশা থামিয়ে হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম যে, আমারা বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য ভারতে ট্রেনিং করতে এসেছি। দয়া করে আমাদের ট্রেনিং করার ব্যবস্থা করে দেন। তখন তারা শামসুদ্দিন মোল্লা ও ওবায়দুর রহমানকে অকথ্যভাবে গালাগালি করলো। বললো, তারা তিনতলায় ঘুমাইতেছে আর আমার দেশের ছেলেরা কত না কষ্ট করে ভারতে ট্রেনিং করার জন্য পথে ঘাটে বসে আছে। এই বলে আমাদের নীলগঞ্জ ট্রেনিং সেন্টার থেকে যে সকল কাগজপত্র দিয়েছিল তা নিয়ে আমাদের ১৭ জনসহ কর্নেল ওসমানী ও মেজর জলিল-এর টাকি হেড কোয়ার্টারে নিয়ে কাগজপত্র স্বাক্ষর করিয়ে আমাদের পুনরায় ট্রেনিং সেন্টারে এনে বললো, ঠিক আছে বাবারা তোমরা বাংলাকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে শপথ নিয়ে ট্রেনিং শুরু কর। বাখুন্ডা ট্রেনিং সেন্টারে কর্নেল ওসমানী ও মেজর জলিলের স্বাক্ষর দেখে আমাদের সকলকে ট্রেনিং সেন্টারে ঢুকতে দিল এবং শুরু হলো ট্রেনিং। অস্ত্র ট্রেনিং ৪৫ দিন করার পর বাংলাকে স্বাধীন করার শপথ গ্রহণ করি। নিজ হাতে হাতিয়ার তুলে নেই। ক্যাপ্টেন বাবুল, ক্যাপ্টেন হেমায়েত ও আবদুল মালেক হাবিলদারকে নিয়ে ৫০ থেকে ৬০ জনের একটি দল গঠন করে একত্রিতভাবে আমরা ট্রেনযোগে বাগদার সীমান্ত হয়ে রাত্রি বেলায় যশোর জেলায় নাম না জানা একটি স্কুলে অবস্থান করলাম।

বাংলাদেশের মধ্যে সকালে গ্রামের লোকে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে কেউ খেজুরের রস, কেউ মুড়ি, নানা জন নানা খাবার নিয়ে হাজির হলো। দুপুরে অনেকে চাল ডাল মাংস ইত্যাদি রান্না করে আমাদের দিয়ে গেল। সকলে তা এক সঙ্গে খেয়ে নিলাম এবং বিশেষ দূত মারফতে জানতে পারলাম পথে তিন রাস্তার মাথায় বসে যে নূর ইসলাম মিলিটারি এসেছে বলে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল দেশদ্রোহী । তখন তাকে রাত্রি আনুমানিক ৭ টার সময় গ্রেফতার করা হয়। এর আগে জানতে পারলাম যশোর আড়পাড়ায় পাকবাহিনী অবস্থান করছে। আমরা আড়পাড়া হতে প্রায় ৯ মাইল দূরে ছিলাম। তখন আমরা রাত্রির খাবার খেয়ে আড়পাড়াতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করব বলে সকলে মিলে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি সময়ে অপারেশন শুরু করতে সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এবং রাত্রি ১০টার দিকে পাকবাহিনী যশোর ক্যান্টনমেন্ট চলে গেছে; কিন্তু রেখে গেছে দেশদ্রোহীদের। আমরা রাত্রি আনুমানিক ২টার সময়

উক্ত আড়পাড়া অপারেশন শুরু করি। তখন তাদের সঙ্গে ফজর পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। তারা সকালে আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ করার পর আমাদের হাতে দেশদ্রোহীরা মারা পড়ল এবং বাদবাকিদের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিয়ে বাংলার স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করে সারাদিন ওখানে অবস্থান করি। পরের দিন রাত্রিবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

গোপালগঞ্জ এসে রাত্রি বেলায় ১৭ জনের একটি দল ক্যাপ্টেন হেমায়েত ও বাবুলকে রেখে খালেক হাবিলদারকে নিয়ে ফরিদপুরের উদ্দেশে রওয়ানা করলাম। নৌকা যোগে দিকনগর হয়ে রাত্রি আনুমানিক ৩টার দিকে চৌকিঘাটা নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে এ্যম্বুশে পড়লাম। তখন আমরা সংকেত দেওয়ার পর বুঝতে পারি তারা মুক্তিযোদ্ধা এবং আমরাও মুক্তিযোদ্ধা। চৌকিঘাটা থেকে আমরা ধর্মদী নামক গ্রামে ক্যাম্প করি। পরের দিন ফরিদপুর, পুখুরিয়া স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করার জন্য সকলে রওয়ানা হই। ফরিদপুর যাওয়ার পর পাক বাহিনী আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আমরা তাদের বন্দি করে স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করি। এর মধ্যে আমরা সংবাদ পাই মোমিন খার হাটে যুদ্ধে হচ্ছে বিহারিদের সঙ্গে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে মোমিন খার হাটের উদ্দেশে রওয়ানা হই। আমরা বেলা ১২টার সময় মোমিন খার হাটে পৌঁছে যুদ্ধে লিপ্ত হই। সামনাসামনি যুদ্ধ করতে করতে সহযোদ্ধা জহুরুল তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তখন তাকে ধরাধরি করে ফরিদপুর হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়। দুই দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর নিকট হার মানে এবং তাকে মাধবপুর কবরস্থানে এনে দাফন করা হয়। এরই মধ্যে বাংলা নামক একটি দেশের সৃষ্টি হয় পৃথিবীর মানচিত্রে। তার পরে কর্মস্থলে চাকরিতে আসার পর সরকারের আহ্বানে স্টেনগান ও গুলি আমি নিজ হাতে ভাঙ্গা থানায় জমা দেই।

সূত্র : জ-৫৪১৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ডেইজি আক্তার	**মুহাম্মদ আলাউদ্দিন তালুকদার (মুক্তিযোদ্ধা)**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	গ্রাম: মাধবপুর, থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
নবম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল: ৮	বয়স: ৬০, সম্পর্ক: বাবা

সে আত্মহত্যা করল

আমার বাবা-মা এবং আমি একদিন পাকিস্তানিদের ভয়ে আমাদের ঘরের সব আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখি ঘরের পিছনে একটা পুকুরের মধ্যে। তারপর দিয়ে রাখি খড়ের গাদা। তারপর আমরা নৌকা নিয়ে সবাই দূরে পালিয়ে যাই।

আরেকদিন আমরা সবাই রান্না করছিলাম, ঠিক সেই সময় পাকিস্তানি সেনা আমাদের বাড়ির পাশে একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ভয়ে ঘরের ভিতর দ্রুত চলে গেলাম এবং বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাদের দেখতে লাগলাম। দেখি, পেছনে রাজাকার আর মাঝখানে কয়েকজন সৈন্য। আমার বড় চাচা মোতালেব মুন্সি। সে ছোট ছোট বাচ্চাদের কোরআন পাঠ করিয়ে বাড়ির দিকে

রওনা দিচ্ছিল। ঠিক সেই সময় পাকিস্তানিদের সাথে দেখা হল তার। তারপর পাকিস্তানি সেনা আমার চাচাকে ধরে নিয়ে গেল। কিছুদূর যাবার পর তারা চাচাকে বলল, কলেমা পড়। আমার চাচা সব কলেমা জানত, তারপর চাচা কলেমা পড়লো এবং চাচাকে তারা ছেড়ে দিল।

আরেকদিন আমার বাবা গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ পাকিস্তানি সেনা বাবাকে একটা বড় তালগাছের সাথে বেঁধে ভীষণভাবে মারল এবং গরুটাকে পানির ভিতর ফেলে দিল। তারপর তারা চলে গেল। একবার আমার ফুফাতো বোনকে ধরে নিয়ে গেল। চার পাঁচ দিন পর সে পাকিস্তানিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলো। কয়েকদিন পর সে আত্মহত্যা করল। আমার দাদা ফরেজ মোল্লার বাড়ি পাকবাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল।

সূত্র : জ-৫৪৫৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ইয়াসমিন	**জবেদা খাতুন**
বোয়ালমারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: ভবানীপুর, থানা: বোয়ালমারী
নবম শ্রেণি, রোল: ১৯	জেলা: ফরিদপুর
	সম্পর্ক: নানি

বিশ্বাসঘাতক লোকজন রাজাকার হয়

১৯৭১ সালের এক সন্ধ্যায় আমার বাবা, দাদা, কাকা ও ফুফু বারান্দার সিঁড়িতে বসা। এমন সময় সাঁ করে দুইটা প্লেন ঘরের উপর দিয়ে উড়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পর আকাশ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে গেল। উত্তর দিক দিয়ে শুধু গুলির শব্দ। কয়েক মিনিট পরই পাক সেনাদের সারিবদ্ধ গাড়ি ফরিদপুর হতে ভাঙ্গার দিকে আসতে লাগল। দাদা রাস্তার ধারে গরু আনতে গেলেন। সবাই ছুটাছুটি করতে লাগল। কে কোথায় পালাবে? বাবা, দাদা, কাকা সবাই পালাতে শুরু করলেন। পালাতে গিয়ে এক ফুফু হারিয়ে গেল। গভীর রাতে আবার বাড়িতে ফিরে আসল। বাড়িতে এসে সবাই মিলে পরিখা খনন করল। দিনের বেলায় সেই পরিখায় খাবারসহ লুকিয়ে থাকত আর রাতের বেলায় উঠে আসত, কাজকর্ম করত।

এমনি করে চলল কিছু দিন। দাদা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত বিমান বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের একজন সৈনিক। তিনি খুব সাহসী এবং ধার্মিক ছিলেন। একদিন দাদা রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, এমনি সময় সারিবদ্ধভাবে পাক সেনাদের গাড়ি যাচ্ছে। তখন একজন পাকসেনা দাদাকে গুলি করার জন্য বন্দুক তাক করেছে। সে সময় অন্য একজন পাক সেনা হাত থেকে বন্দুক নিয়ে যায়, ফলে দাদা বেঁচে যান। পাক হানাদার বাহিনী প্রায়ই রাস্তার পাশের গ্রামের বাড়িতে ঢুকে খাসি নিয়ে যেত, ডাব পেড়ে খেত।

ক্রমান্বয়ে পাক সেনাদের অত্যাচার বাড়তে থাকে। বাবা তখন ছোট। পাকসেনাদের অত্যাচারে আস্তে আস্তে মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। এতে যোগ দেয় ছাত্র, জনতা, শ্রমিক সব ধরনের লোকজন। আমাদের দেশের কিছু বিশ্বাসঘাতক রাজাকার হয়। এমনি এক রাজাকারের দল আমাদের বাড়ির পাশের এক হিন্দু পরিবারের ঘর-দরজা ভেঙে নৌকায় নিয়ে যায়। ওই

বছর প্রচুর বৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থানে নিরীহ জনগণকে পাকসেনারা পাখির মতো গুলি করে মেরেছে এবং মেয়েদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে।

মাধবপুর গ্রামে ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। এতে ৩০ লাখ নিরীহ লোক মারা যায়। দেশ স্বাধীন হলো, পাকসেনা আত্মসমর্পণ করল।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগের নেতা এবং মুক্তিবাহিনী দৌলতদিয়া ঘাট অবরোধ করে রাখে যাতে পাকসেনা ফরিদপুরে ঢুকতে না পারে। এক রাতের অন্ধকারে নাড়ার ট্রাকে ফরিদপুর শহরে এক প্রভাবশালী নেতার নেতৃত্বে পাক সেনা ঢুকে পড়ে। পরদিন ভোরে গাড়িতে মেশিনগানের গুলি ও শেল ছুড়তে ছুড়তে ভাঙ্গা বন্দরে এসে পৌঁছায়। ভাঙ্গা বন্দর তখন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। আর চারদিকে গুলি ছোড়ে এবং ওই গুলিতে একজন সাধারণ লোক মারা যায়। মুসলিম লীগের নেতাদের নিয়ে পুন্দার বাজার ও বানিয়া বাজারে ৩৫ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে হাত-পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। জুলাই মাসের দিকে সারা বাংলাদেশে রাজাকার, আলবদর পাক সেনা ছড়িয়ে পড়ে।

ভাঙ্গা থানার নুরুল্লাগঞ্জ ইউনিয়নে গঙ্গাবুর্দি গ্রামে একজন রাজাকার ছিল। তার নাম মালেক মাতুব্বর। একদিন তার বাড়ির পাশের একটি বিলে তথ্য প্রদানকারীসহ ৩০ থেকে ৩৫ জন যুবক স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে নৌকায় বসে আলোচনা করছিল। তখন হঠাৎ মালেক মাতুব্বর ওই পথ দিয়ে নৌকায় আসার সময় সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে, এ দেশ কখনই স্বাধীন হবে না, তোমাদের মতো লোক স্বাধীনতা আনতে পারবে না। তোমরা ভুলপথে পা দিও না। ওই ৩৫ জন যুবককে এই বলে শাসায়। তার এই কটূক্তি এবং খারাপ আচরণের জন্য সবাই প্রতিজ্ঞা করে যে, 'আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যাব। প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা অর্জন করবই।' এরপর তারা আরও যুবক ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করে। মোট ৬৫ জন যুবক একসঙ্গে ভারতে যায়।

যাওয়ার পথের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমার মামা রফিক মৃধা বললেন, ৬৫ জন যুবক ১০টি নৌকায় করে ফুকুর হাটি ব্রিজের নিচ দিয়ে যখন পাড়ি দেয় তখন তার বাবা ও মামা এবং মাধবপুরের মাওলানা ফজলু হক ব্রিজের উপরে পাহারা দিচ্ছিল। পানাডুবির পাশে অনেক অভিভাবকই তাদের সন্তানদের বিদায় জানান। বিদায় মুহূর্তে যে করুণ দৃশ্য হয়, তা ভাষায় বলা যায় না।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যাওয়ার সময়কার একটি ঘটনা: গঙ্গারামপুর থেকে মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় নৌকাযোগে কালা নামক স্থানে যাওয়া যায়। সে সময় নৌকার মাঝিরা ৬৫ জন লোককে আড়পাড়া রাজাকার ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝিরা ভয় দেখিয়ে বলেছিল, সামনে মানদার তলায় নাকি পাকসেনারা মাঝে মাঝে আসে। এর জন্য সবগুলো নৌকায় সকল লোক নীরবতা পালন করছিল। রাজাকার ক্যাম্পের সামান্য একটু দূরে থাকা অবস্থায় গুলির শব্দ শোনা যায়। তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম নৌকায় থাকা সফিউদ্দিন আহমদ চিৎকার করে বলেন, সামনে রাজাকার ক্যাম্প, সকল নৌকা ঘুরিয়ে ফেল। মাঝিরা নৌকা ঘোরাতে চাইল না। তখন মাঝিদের মারধর করে নৌকার খোলে বেঁধে রেখে নিজেরা নৌকা চালিয়ে পিছনের দিক ফিরে আসার সময় একদল মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা মাঝিদেরকে রাজাকার বলে শনাক্ত করে। মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকারদের বেদম প্রহার করে।

পরের দিন মুক্তিযোদ্ধারা অন্য নৌকা করে কালার দিকে রওনা দেয়। পথিমধ্যে দুটি শরণার্থী নৌকা আমাদের বহরে যোগ দেয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে ৪টি নৌকায় রাজাকাররা এসে আমাদের বহরের প্রথম নৌকাটির মালামাল ও টাকা পয়সা সব লুটে নিয়ে যায়। শরণার্থী নৌকা দুটির সকল মালামাল টাকা পয়সাসহ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। এমনকি উক্ত নৌকার সকল মহিলাদের পরনের কাপড় খুলে নিয়ে প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলে। এই দৃশ্য দেখে আমরা সকলে কায়মনোবাক্যে আলাহর কাছে অভিযোগ করেছিলাম, আল্লাহ ওদের উপর গজব নাজিল কর। বাংলাদেশ স্বাধীন করে দাও। সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধিকার তুমি দিতে পার।

নারীদের উপর নির্যাতনই ওদের পতনের মূল হয়ে দাঁড়ায়।

সূত্র : জ-৫৩৯৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আরাফাত রহমান (নিশান)	**মাহফুজুল হক**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	সম্পর্ক: বাবা
৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ২১	**আবুল কাশেম মৃধা**
	সম্পর্ক: নানা

ইহা মুসলমানের বাড়ি

১৯৭১ সাল। আমাদের দেশে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ করে, তখন আমাদের গ্রামের অনেকেই প্রাণের ভয়ে এবং অন্যান্য এলাকার অনেকেই অর্থের লোভে রাজাকারের খাতায় নাম লেখায়। সে সময় পাকিস্তানিরা বড় লোকদের বাড়িতে আক্রমণ করে ধন-সম্পদ টাকা পয়সা এনে রাজাকারদের দিত। আমাদের গ্রামের অনেকেরই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুযোগ পায়নি। অনেকেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। পার্শ্ববর্তী এলাকারও অনেকেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তাদের সাথে আমাদের গ্রামের রাজাকাররা যোগাযোগ রাখত। আমাদের গ্রামে কোনো মুক্তিযোদ্ধা ছিল না, তাই পাকিস্তানিরা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করত না। আমাদের পাশের এলাকার বৃদ্ধ মুসলমানদের হত্যা করত না। অনেক হিন্দু লোকে ভয়ে দরজায় লিখে রাখত ইহা মুসলমানের বাড়ি। এতে তাদের ভয় কিছুটা কমত।

একদিন আমার নানা রাস্তা দিয়ে তালের রস আনছিল। এমন সময় পাকিস্তানিরা সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সাথে ছিল একজন রাজাকার। তাদের দেখে নানার ভয়ে হাত পা কাঁপতে লাগল। রাজাকারটি নানাকে বলল, এতে কী আছে? নানা ভয়ে ভয়ে বলল, এতে রস আছে। রাজাকারটা হানাদারদের রস খেতে বলল। হানাদাররা হাঁড়ি ধরে খেতে লাগল। তা দেখে নানার ভয়ের সময়ও হাসি পেল। তাই দেখে একজন তাকে গুলি করতে চাইল। নানাও ভাবছে আমাকে যদি মারে তাহলে আমিও একটাকে মেরে মরব। এই ভেবে তার হাতে ছুরি ধরে রাখল। পরে রাজাকারটি নানাকে বলল, তোমার রস খেয়ে তারা খুশি হয়েছে। এই বলে তারা চলে গেল। নানা মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ি ফিরল।

একদিন তাদের সামনে পড়ে আর একজন বয়সী লোক। লোকটিকে দেখে হানাদাররা তার কাছে গিয়ে ধরে ফেলে। তাকে নাম জিজ্ঞাসা করে আর সে হিন্দু না মুসলমান তা বলতে বলে। লোকটি বলে' সে মুসলমান। আসলে সে ছিল হিন্দু। পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। লোকটি ভাবছিল যদি তাকে মারতে আসে তাহলে সে পুল থেকে লাফ দেবে। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। সে মনে করল তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছন থেকে গুলি করবে। কিন্তু হানাদাররা চলে গেল। সেদিন মিথ্যা বলে লোকটি বেঁচে গেল।

হানাদার বাহিনী অন্য এলাকায় গিয়ে ক্যাম্প ফেলে। সে এলাকা থেকে যুবক ছেলেদের ধরে এনে লাইন ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। কারণ সে এলাকার অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা ছিল। যখন সেই এলাকার মুক্তিবাহিনী জানতে পারে তখন রাতের অন্ধকারে হানাদার বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। শুরু হয় যুদ্ধ। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় রাতের অন্ধকারে উড়ে যাচ্ছে হাজার পোকা আর আগুনের ফুলকি। যুদ্ধ থামে ভোর হওয়ার পর। মুক্তিবাহিনীর কয়েকজনের গুলি লাগে। একজনের মাথায়, আরেক জনের হাতে। তাদের রক্তের বিনিময়ে এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

কিছু দিন পরে নদী দিয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন রাজাকার। তাদের দেখে এলাকার লোকেরা মুক্তিবাহিনীকে খবর দেয়। মুক্তিযোদ্ধারা এসে নদীর এক পার থেকে গুলি করলে একজনের চোখের পাশে গুলি লাগলে চোখ বেরিয়ে যায়। সে চিৎকার করতে করতে নৌকায় পড়ে যায়। আর অন্যদের গুলি গায়ে লাগে। পরে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এভাবে সে এলাকা শত্রুমুক্ত হয়।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের ফলে এই দেশ স্বাধীন হয়। বিদেশি শত্রু থেকে মুক্ত করা গেলেও আমাদের দেশকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করা যায়নি। তারা সুযোগ পেলে নানা রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই আমাদের উচিত এদের বিচার করা।

সূত্র : জ-৫৩৯৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. আরিফ	**মো. আলিমউদ্দিন**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	বয়স: ৮৫
৭ম শ্রেণি, রোল: ৯	

বলতে গেলে কান্না চলে আসে

আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে আমাদের দেশ লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। তখন আমি জন্মগ্রহণ করিনি। তাই এ সম্পর্কে আমার ধারণা ততটা সুস্পষ্ট নয়। অবশ্য আমার মা-বাবা, চাচা-চাচি, দাদা-দাদি সবাই যুদ্ধ দেখেছে এবং যুদ্ধের কাহিনী সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা আছে। তাই আমি আমার বড় চাচির কাছ থেকে কাহিনীটি শুনে লিখেছি। ভুল ত্রুটি হলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ হাফেজ।

আমি যখন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আমার মায়ের কাছে জানতে চাইলাম তখন মা বললেন, মুক্তিযুদ্ধের কথা আর কি বলবো! সে ঘটনা বলতে গেলে কান্না চলে আসে। তাই বলে মা আমার কাছে আর মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী বললেন না। তার পরের দিন ৬ সেপ্টেম্বর রাত দশটায় সময় আমি আমার বড় চাচির কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে গেলাম। তিনিও আমাকে ওই একই কথা বলেছিলেন। তারপর তাকে আমি কাকুতি মিনতি করে কাহিনীটি শুনলাম।

যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে তখন ছিল ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাস, তারিখ ঠিক মনে নেই। ঐ দিন পাকবাহিনী আমাদের এই ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার অন্তর্গত কামারখালী বাজারে বোমা বর্ষণ করে। বোমাটি বাস্ট না হওয়ার কারণে পুরো কামারখালী বাজারের ঘরগুলো পুড়িয়ে ফেলে। তার আগে বাজারের ঘরগুলোতে যা যা ছিল সব লুটপাট করে নেয়। এই ঘটনা যখন আমাদের বাড়ির সবাই জানতে পারল তখন যে যার মত সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার প্রোগ্রাম করল। ঠিক সে সময় আমার বাবা এসে তাদেরকে বাধা দেয়। আসলে আমার বাবা ছিল একটু জেদি প্রকৃতির। তারপর সবাই চলে গেলেও আমার বাবা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি। বাড়ি থেকে সবাই যখন চলে যায়, পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধা ভেবে আমার বাবাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। সেই আঘাতে আমার বাবা যখন কাতর হয়ে পড়েছিল তখন তাকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন সময় ওই দলের এক মেজর এসে বললো যে, ওই ব্যক্তি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে। ফলে বাবাকে গুলি করে না।

এই ঘটনা ঘটার আগে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি ক্যাম্প আমাদের বাড়ির পাশে ছিল। তারা বলেছিল যে, আমরা আপনাদের কিছু বলব না, আপনারা শুধু আমাদের সাহায্য করবেন। অবশ্য বেশি সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার জন্য তারা এভাবে বাবাকে মেরেছিল। তখন মনে হয়েছিল যে, আমি যদি তাদের মেরে ফেলতে পারতাম! আমার একটাই দুঃখ, আমার বাবা যুদ্ধে যাবার আগেই প্রচণ্ডভাবে আঘাতে পেয়েছিল। তারপরের দিন ছিল আরও দুঃখের আরও কষ্টের। বাবার ওই আহত শরীর নিয়ে কোথায় যাবে কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। সে সময় আরও ছিল খাদ্যের অভাব, ওষুধের অভাব, চিকিৎসার অভাব। এই দুঃসময়ে কে তাকে সেবাযত্ন করবে!

আর একটি কথা, আমার বড় ভাই-এর বয়স ছিল দু বছর। আমার মেজ ভাই ছিল ৬ মাসের পেটে। এই দুঃসময়ে সকলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কারও খবর নেওয়ার সময় নেই। তখন স্ত্রীতো আর স্বামীকে ফেলে যেতে পারে না, যত দুঃখ কষ্ট হোক তার কাছে থাকতেই হবে। যখন আমার বাবার কাছ থেকে সবাই চলে আসল তখন আমার মা অসহায় এর মত বাবাকে নিয়ে ছুটে বেড়াতো। তখন ঐ অসুস্থ মানুষটিকে নিয়ে কত পানি, শক্ত ঢিলার মাঠ যে পাড়ি দিতে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপর যেতে যেতে মা এক নদীর কাছে এসে পৌঁছালো। তখন বাবার একটু হুঁশ হলো। বাবা বলল যে, একটু পানি। তখন মা পানি আনার জন্য ঐ নদীতে গেল। মা যখন নদীতে গেল তখন এক রাখাল বালকের সাথে দেখা। তখন সে মাকে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনার বাড়ি কোথায়? কোথায় যাবেন, কি আপনার পরিচয়? মা উত্তরে বলল, এখন কোনো বাড়িঘর নেই, কোথায় যাবো তারও ঠিক নেই, আর আমার পরিচয় হচ্ছে আমি শিকদার বাড়ির বৌ। আমডাঙ্গার সেলিম মৃধার ছোট মেয়ে আমি। সে ছিল আমার মায়ের বোনের ননদের বাড়ির রাখাল বালক। একদিনের দেখায় একটু চেনা-পরিচয় হয়েছিল। তারপর সব কিছু জেনে মায়েদেরকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। ঐ বাড়ি নেওয়ার পর মা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর সেবা যত্নে উপযুক্ত চিকিৎসায় বাবা সুস্থ হয়ে উঠল।

ঐ গ্রামে যুদ্ধ হচ্ছিল না। সে সময় জানতে পারল যে, যুদ্ধ প্রায় শেষ। ভারত সরকার বাঙালিকে বাঁচানোর জন্য বিমান দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণ করে। যুদ্ধ যখন একেবারে শেষের দিকে তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের অনেক চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিক্ষকদের ধরে নিয়ে তাদেরকে হাত পা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে। তারপর লক্ষ লক্ষ প্রাণের এবং হাজার হাজার নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হলো।

এই হলো আমার বড় চাচির কাছ থেকে শোনা মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী। আসলে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী শুনতে গেলে আফসোস লাগে যে, যদি আমি সে সময়ে জন্ম নিতাম, দেশের জন্য কিছু করে যেতে পারতাম। অবশ্য এখনো আমার ইচ্ছা আছে। যদি আবার কোনো সময়ে এমন পর্যায় আসে তাহলে আমি রুখে দাঁড়াবো তাদের বিরুদ্ধে যারা এ দেশটাকে ধ্বংস করতে চায়। অবশ্য আমার জীবনের সার্থকতা ওইখানেই। তারপরও আমার জীবনের সার্থকতা লাভ করেছি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কিছু লিখতে পেরে। ধন্যবাদ এই ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে, ধন্যবাদ আমার বড় চাচিকে।

সূত্র : জ-৫১১০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মঞ্জুরা খাতুন	**হায়েতুন্নেসা বেগম**
কামারখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : চাচি
১০ম শ্রেণি, মানবিক শাখা,	

আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছে

শান্তি বাবু ছিলেন একজন সরকারি চাকরিজীবী। তিনি রাজশাহী কো-অপারেটিভ ব্যাংকে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ। সততার জন্য অফিসের সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। তার ছিল দুই ছেলে আর তিন মেয়ে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি খুব সুখেই ছিলেন। আর এর মধ্যে শুরু হলো স্বাধীনতার যুদ্ধ। যুদ্ধ চলাকালীন শান্তি বাবুর কোনো শারীরিক সমস্যা হয়নি এবং তাকে মেরে ফেলার জন্য কোনো হুমকি দেওয়া হয়নি। তাই তিনি ভালই ছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি যে, যুদ্ধের শেষ সময়ে তার জীবনে এমন ঘটনা ঘটবে।

১৫ ডিসেম্বরে তিনি আপন মনে অফিসের সব কাজ সেরে বাসায় ফিরেছেন। বাসায় ফিরে সবার সাথে কথাবার্তা বলে হাত মুখ ধুয়ে খাবার জন্য টেবিলে আসেন। তখন সময় রাত ৯টা। ঠিক সে সময়ে তার জীবনে নেমে আসে মরণের কাল ছায়া। চারজন লোক এসে তাকে ডেকে বললো, আপনি এখনি আমাদের সাথে অফিসে আসেন। আপনার অনেক কাজ বাকি আছে। অফিস থেকে আমাদেরকে আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছে। এই কথা শুনে শান্তি বাবু বললেন, আমার এখন কোনো কাজ থাকার তো কথা নয়। যদি থাকে তাহলে আমি সকালে গিয়ে করবো। কিন্তু তার কথা হানাদার বাহিনী কিছুতেই শুনলো না। তাকে জোর করে ধরে নিয়ে

গেল। তার আর ভাত খাওয়া হলো না। পরিবারের সবাই সারারাত ধরে তার জন্য অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু তাঁর আর ফেরা হলো না। এভাবেই রাত্রি কেটে গেল।

সকাল হতেই একজন লোক এসে বলল, পদ্মার পাড়ে একটি লোকের আধা মাটি চাপা দেওয়া লাশ পড়ে আছে। আপনারা এসে দেখে যান লোকটি আপনাদের পরিচিত কি না? এই কথা শুনে তার পরিবারের সবাই হতাশ হয়ে পড়ল। তবে আর কি করা, তাই তার বড় ছেলে দেখতে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, সে আর কেউ নয়, তার বাবা। আর এভাবেই প্রাণ দিলেন সৎ, দেশঅন্তঃপ্রাণ একজন মহান ব্যক্তি।

সূত্র : জ-৫৪৬২

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মিতালী হালদার	**রতিকান্ত হালদার**
বোয়ালমারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: আঁধাকোঠা, থানা: বোয়ালমারী
১০ম শ্রেণি, রোল: ০১	জেলা: ফরিদপুর
	বয়স: ৮৫, সম্পর্ক: দাদু

পাকবাহিনীকে পালন করত রাজাকাররা

১ম ঘটনা: আমি একদিন কাজ করে বাড়িতে ফেরার পথে দেখলাম একজন লোক, নৌকা বেঁধে রেখে বটবৃক্ষের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ পাক বাহিনী ঠক ঠক জুতা পায়ে এসে তাকে গাছের সাথে বেঁধে, হাত উঁচু করে নির্মমভাবে গুলি করে মেরে ফেলে। আমি পাক বাহিনীকে দেখে পাশে বেত ঝোপে গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তা না হলে মাঝির মত হয়ত আমাকেও জীবন দিতে হত। আমি সবই নীরবে চেয়ে দেখলাম। পাক বাহিনী চলে গেলে আমি বাড়িতে ফিরে আসি।

২য় ঘটনা: আমাদের পরিবারে তখন আমরা পাঁচ ভাই ও মা। আমাদের মা সব সময় আল্লাহর ইবাদত করতেন ঘরে বসে। একদিন হঠাৎ করে পাক বাহিনী এসে পড়ে। আশেপাশের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। তারপর আমাদের বাড়িতে আসে। ঘরে বসে ইবাদত করতে দেখে মাকে জিজ্ঞেস করে, মুসলিম হ্যায়? মা বললো, বাবা আমি গরিব মানুষ, আমার ঘরটা পুড়িয়ে দিও না। একথা শুনে পাক বাহিনী ঘরের সামনে অর্থাৎ উঠানের মাঝখানে আগুনের মশালটি ফেলে রাগান্বিতভাবে চলে যায়।

৩য় ঘটনা: আমি, তাহের, আলালদ্দি ও আলী আমরা চারজন মিলে একসাথে রিকশা চালাতাম। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আমরা পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম। পাশের জঙ্গলে আমরা রিকশা রেখেছিলাম। হঠাৎ করে এক সময় গাড়িতে পাক বাহিনী এসে পড়ে। আমরা চারজন পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে সব কিছু দেখছিলাম। পাক বাহিনী এসে মেশিনগান ইত্যাদি ধরণের অস্ত্র চালাতে শুরু করল। আমরা সব সময়ই ভাবতাম পাক বাহিনী কখনো কাঁচা মাটিতে নামে না। তারপর পাক বাহিনী গাড়ি থেকে নেমে এসে মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে শুরু করে। এমন অবস্থা

দেখে আলালদ্দি খুব চিন্তিত হল। কারণ তার ঘরে ট্রাংকের ভেতর ছিল বেশ কিছু টাকা। এমন অবস্থায় তার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই ভেবে আলালদ্দি জঙ্গল থেকে বের হয়ে ঘরের পেছন দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দরজার নিকট পৌঁছল। এমন সময় পাক বাহিনী তাকে দেখে ফেলে। দেখা মাত্র তাকে বলে দাঁড়া। আলালদ্দি তার জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড় দিল। পাক বাহিনী মেশিনগান দিয়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ করে। তখনও তার জ্ঞান ছিল। কোমর থেকে গামছা খুলে মাথায় বাঁধে। আলালদ্দি পাখির মত লাফাতে লাফাতে পালাবার চেষ্টা করছিল। তখন পাক বাহিনী বলল, বাঙালি মরতে নেহি। আবার মেশিন গান দিয়ে তার বুকে আরেকটা গুলি করে। তারপরও পশুর মত গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। নিষ্ঠুর পাক বাহিনী তারপরও তার বুকে আরেকটি গুলি করে। গরু জবাই করলে যেমনভাবে রক্ত ছিটকে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে রক্ত বের হয় তার মাথা ও বুক থেকে। লাফাতে লাফাতে এক সময় সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পাক বাহিনীর তার পরও সন্দেহ হচ্ছিল। এরপর আলালদ্দির লাশের নিকটে পাক বাহিনী দেখতে গেল সে মরেছে নাকি জীবিত আছে। যখন দেখল যে আলালদ্দি মৃত্যুবরণ করেছে, তখন লাশে লাথি মেরে নিষ্ঠুর পাক বাহিনী চলে গেল। তারপর আমি, তাহের ও আলী তিনজনে মিলে আলালদ্দির লাশ উদ্ধার করি। নিষ্ঠুর পাকবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল এ দেশকে ধ্বংস করা, লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া।

৪র্থ ঘটনা: আমি যুদ্ধ চলাকালীন নৌকার মাধ্যমে হাট-বাজারে গিয়ে গম ও আটার ব্যবসা করতাম। বাজারের ঘাটের নিকটে পৌঁছতে না পৌঁছতেই জোরপূর্বক খাজনা আদায় করত রাজাকাররা। সাধারণত বলা যায় পাক বাহিনীকে পালন করত রাজাকার। রাজাকাররা যা আদেশ করতো তা সঠিকভাবে পালন না করলে পশুর মত গুলি করে হত্যা করত। তাদের পাওনা আদায়ের জন্য পাক বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাজাকাররা হত্যাকাণ্ড শুরু করে। রাজাকাররা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও খারাপ চরিত্রের অধিকারী। রাজাকারদের চরিত্র ছিল পশুর মত, কত হাজার হাজার মা-বোনকে নষ্ট করেছে তারা। পাকিস্তানিদের সঙ্গে একমত হয়ে তারা এ দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ১৯৭১ সালের নিরীহ বাঙালিদের সম্পত্তি নিজের নামে লিখে নেয় রাজাকাররা। তারা কখনোই দেশের শান্তি চায়নি, বরং ধ্বংস চেয়েছিল।

সূত্র : জ- ৫৩৫১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রফিকুল ইসলাম	**মো. রায়হান মোল্লা**
লস্করদিয়া আতিকুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম+পোস্ট: লস্করদিয়া
৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ১৭	থানা: নগরকান্দা, জেলা: ফরিদপুর
	বয়স: ৫২ বছর

শালা কান্দে বাবাগো মাগো বলে

আমার পিতা ছিলেন একজন কৃষক। ২৫ মার্চ বেলা ১০-১১টার সময় রাস্তায় গুলির শব্দ শুনে তিনি পুখুরিয়া বাসস্ট্যান্ড গেলেন। তিনি পুখুরিয়া থেকে দেখতে পেলেন রাস্তার দুই ধারে

হানাদার পাকবাহিনী আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তখন আমার বাবা এ অবস্থা দেখে প্রাণ নিয়ে বাড়ি চলে এলেন। ওদিকে কিছু লোক পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। সব গ্রামে হানাদার বাহিনী রাজাকারদের নিয়ে অত্যাচার শুরু করল। গ্রামের সকল লোক প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাকত। আমার বাবা আমাদের ভাইবোনদের নিয়ে লুকিয়ে থাকতেন। একদিন তিনি খবর পেলেন বাইনা বাজার নামক এক গ্রামে হানাদার পাকবাহিনী প্রচণ্ডরকম অত্যাচার শুরু করেছে। তা শুনে তিনি সেখানে গেলেন। দেখতে পেলেন ২৫-৩০ জন পুরুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সাথে গুলি ছুড়ল। অনেক শিশু হত্যা করল। নারী নির্যাতন শুরু করল এবং যেসব মহিলা ঘর থেকে বের হয় না সেসব মহিলাও প্রাণের ভয়ে পালাল। বাবা এ ঘটনা দেখে জীবন রক্ষার জন্য ঝোপঝাড় পেরিয়ে বাড়ি আসলেন।

আদমপুর সুরেণ দত্তের বাড়ি লুট এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার সময় বাবা ওই রাস্তা দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। সেদিন ছিল শনিবার। হাটের দিন। বাজারের নাম চৌদ্দরশী। এ অবস্থা দেখে আমার বাবা আর হাটে গেলেন না। এরপর থেকে এখানে-সেখানে গুলির শব্দ। গ্রামের লোকজনকে রাতের ঘুম হারাম করে পালিয়ে থাকতে হয়। হাটেবাজারে যাওয়া যেত না। লুকিয়ে লুকিয়ে বাজার করতে হতো। অনেক কষ্টে দিন চলত।

কিছু দিন পর বন্যা শুরু হলো। রাস্তাঘাট হাটবাজার সব তলিয়ে গেল পানিতে। গোপনে একটি হাট বসল। সেখানে আমার বাবা হাট করতে গেল। এমন সময় হানাদার পাকবাহিনী সেখানে এলো। তখন যার যার নৌকায় ওঠে পালাল সকলে। আমার বাবা দূর থেকে দেখলেন একটি লোককে গুলি করে সেখানে যে ব্রিজ ছিল সে ব্রিজের নিচে ফেলে দিল। আস্তে আস্তে যত যুদ্ধ চলে তত আমার বাবার সাহস বাড়ে। তিনি মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতা করতেন এবং তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। নওপাড়া নামক একটি গ্রামে আমার বাবা বিয়ে করেন। সেখানে আমার একটি ভাই হয়। তিনি শুনলেন আমার ভাই হয়েছে। সেটা রোববার পুখুরিয়া হাটের দিন। সাহস করে তিনি হাটের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে বাসে উঠলেন। তখনো হানাদার বাহিনী পুখুরিয়া ব্রিজে হাঁটাচলা করছিল। আমার বাবা বাসে চড়ে নানাবাড়ি গেলেন। নানাবাড়ি গিয়ে দেখলেন আমার ভাইয়ের অসুখ। তা দেখে তিনি চিন্তা করলেন কীভাবে বাড়ি যাওয়া যায়।

নওপাড়া আমার বাবার আত্মীয় বাড়ি। তিনি ছিলেন রাজাকার। তার নাম গম্ভার। বাবা যখন চিন্তায় ছিলেন তখন তিনি আমার বাবাকে সাহস দিয়ে বললেন, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি ফুরহাটি ব্রিজে থাকব। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। এ কথা শুনে আমার বাবা মনে সাহস জুগিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। সান্ত্বনা পেয়ে হেঁটে চললেন আমার বাবা। তখন তিনি ফুরহাটি ব্রিজের কাছে তখন তার সামনে প্রায় ১৫-১৬ হাত আগে একটি লোক হেঁটে চলছিল। লোকটি যখন ব্রিজের ওপর তখন হানাদার বাহিনীর ৪ জন ও কিছু রাজাকার সে ব্রিজের ওপর ছিল। লোকটি ব্রিজের ওপর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একজন হানাদার এসে তার কাঁথার গাট্টি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে বলল, হিন্দু না মুসলিম হায়। হানাদার বাহিনীর কাঁধে বন্দুক ও হাতে বড় রকমের রোলার ছিল। রোলার দিয়ে লোকটাকে মারতে শুরু করল। লোকটা চিৎকার করে বলল বাবা গো মা গো। হানাদার বাহিনী বলল, শালা মালায়ন আলারে শালা কান্দে বাবাগো মাগো বলে। এ অবস্থা দেখে বাবা ভয় পেলেন। তবু ভয়ে ভয়ে ব্রিজে উঠলেন। ব্রিজে ওঠে এদিকে ওদিকে তাকালেন। কোথাও তার আত্মীয়কে দেখতে পেলেন না। এমন সময় হানাদার বাহিনী

লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে আমার বাবাকে ধরল। বাবাকে এসে বলল, হিন্দু না মুসলিম হায়। বলে তার পকেট এবং শার্ট খুঁজে ১৬ টাকা পেয়ে নিয়ে গেল। এমন সময় তার আরেক পরিচিত আত্মীয়, শাজাহান মাস্টার এলো। সে ছিল রাজাকারের কমান্ডার। আমার বাবাকে দেখে সে নওপাড়ার জামাই হিসেবে চিনে এগিয়ে এলো। তখন আমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আমার শালা গম্ভার কি এখানে আছে? তার তো এখানে ডিউটি করার কথা। তখন শাজাহান মাস্টার বললো, সে তো এখানে ছিল কিছুক্ষণ আগে, এখন সে জামতলার ব্রিজে চলে গেছে। যখন তারা দুজন কথা বলল, তখন হানাদার বাহিনী অবাক হয়ে গেল। তখন শাজাহান মাস্টারকে জিজ্ঞেস করল, হিন্দু না মুসলিম হায়? শাজাহান মাস্টার বলল, মুসলিম হায়, সাদি করতা হায়, লাড়কা হায়। এভাবে হানাদার বাহিনীকে শাজাহান মাস্টার উর্দু ভাষায় তাদের বোঝাল। হানাদার বাহিনী সব শুনে, আমার বাবার পকেটের ১৬ টাকা দিয়ে দিল। টাকা দেওয়ার পর হানাদার বাহিনী আমার বাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, ঠিক হায় বাঙালি ছুড়দে। তখন আমার বাবা উর্দু না বুঝে বুঝলেন আমাকে বুঝি গুলি ছুড়তে বলেছে, এ ভেবে আমার বাবার শরীর কাঁপতে থাকে। শাজাহান মাস্টার এসব কাণ্ড দেখে বলল, আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে।

তারপর তিনি বাড়ি ফিরে ভাবলেন, আর নওপাড়া যাবেন না। আবার কিছু দিন পর সংবাদ এলো আমার ভাইয়ের ভীষণ অসুখ। আবার আগের মতো সেখানে গেলেন। সেখানকার মানুষ ঘরের ভেতর ও বাইরে গর্ত করে তার ওপর টিন ও মাটি দিয়ে থাকতো। সেদিন রাত্রে আগের মতো আমার বাবা মাটির ভিতর ঘুমিয়ে ছিলেন। এমন এক রাতে মুক্তিবাহিনী ভাঙ্গা থানা আক্রমণ করল। ভাঙ্গা থানা যেন আগুন হয়ে উঠল। এভাবে সারা রাত যুদ্ধ চললো। তার সঙ্গে মুক্তিবাহিনী বাখুন্ডার ব্রিজ ভেঙে ফেললো। ভেঙে ফেলার আগের রাত্রে ৩০০ পাকবাহিনীর গাড়ি চলে গেল। যুদ্ধের পরের সকালে যখন হানাদার বাহিনী চলে গেছে তখন আমার বাবা গজাইরা, ফুখুর হাটির ডাঙ্গা পাড়ি দিয়ে নাজিরপুরের ভেতর দিয়ে ব্রাহ্মণকান্দা হয়ে অনেক কষ্টে বাড়ি চলে আসেন। আমার বাবা যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর নওপাড়া গেলেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার মন গর্বে ভরে গেল।

সূত্র : জ-৫৩৬১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রেবা আক্তার	**মো. ইসরাইল শেখ**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	গ্রাম: আদমপুর, পোস্ট: ফাজিলপুর
ষষ্ঠ শ্রেণি, গ শাখা, রোল: ২৮	থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
	সম্পর্ক: পিতা, বয়স: ৬৫

আমাদের কেন মারবে?

মিলিটারি গ্রামেও এসেছিল। তারা মানুষের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। আমার দাদার ভাগ্নির জামাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। আমার দাদা বলেন, তারা বাড়িতেও এসেছিল।

দাদাবাড়ির সামনে একটা মসজিদ আছে। তারা মসজিদ দেখে খুব খুশি হয়। তখন তারা বাড়ির ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমার দাদা ও তার ভাইয়েরা মিলে ঢুকতে বাধা দেয়। তাদের আম ও ডাবের পানি খাইয়ে বিদায় করে দেয়। তারপর তারা আমাদের পাশের গ্রাম কালিবাড়ি গিয়ে দুই জন হিন্দু লোককে মেরে ফেলে। তার কয়েকদিন পরই আমাদের বাড়ি থেকে অল্প একটু দূরে এক পুলের নিচে মিলিটারির গাড়ি পড়ে যায়। তারা হাউমাউ করে চিৎকার করে ওঠে। আশপাশের লোকজন গিয়ে তাদের ওঠায়। মিলিটারিদের তারা বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নিয়ে তারা মিলিটারিদের অনেক যত্ন করে এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়িতেই থাকে। সুস্থ হওয়ার পর মিলিটারিরা ওই বাড়ির মালিকদের মেরে ফেলতে চায়। ওই বাড়ির মানুষরা অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে বলে যে, আমরা তোমাদের এত আদর যত্ন করলাম আমাদের কেন মারবে? তবুও তারা কথা মানতে চায় না। অনেক বুঝিয়ে তারা মিলিটারির হাত থেকে বাঁচে। মিলিটারি তখন এখান থেকে গিয়ে ভাঙ্গা থানা জ্বালিয়ে দেয়। ভাঙ্গা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়। মিলিটারি হিন্দু দেখতে পারত না। ভাঙ্গায় হিন্দু বেশি ছিল বলে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিলিটারিরা রাস্তা দিয়ে যেত আর গুলি করত।

আমাদের ভয় ছিল বেশি। কারণ আমাদের বাড়ি রাস্তার পাশে। সেজন্য আমার দাদা-দাদি ও কাকা-ফুফুরা সবাই মাটিতে ঘুমাত যাতে গুলি করলে ওপর দিয়ে চলে যায়। দিনের বেলা যখন মিলিটারি আসত তখন আমাদের বাড়ির সবাই গর্তের ভেতর গিয়ে পালাত। আমার দাদা বলেন, যুদ্ধ যত দিন পর্যন্ত চলে ততদিন তারা ঠিকমতো খেতে ও ঘুমাতে পারেননি। অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কেটেছে খুব কষ্টের সঙ্গে। এ সময় কৃষকরা মাঠে ফসল ফলাতে পারেনি। তাই খাদ্যেরও খুব অভাব হয়েছিল। বিশেষ করে গরিবদের বেশি অসুবিধা হয়েছিল। তাছাড়া এ সময় সব কিছুর দাম বেড়ে গিয়েছিল। মিলিটারি গ্রামের সহজ-সরল মানুষের প্রতি অনেক অন্যায় অত্যাচার করেছে।

দাদা আরো বলেন যে, আমাদের দেশে এত ক্ষয়ক্ষতি হতো না। এই ক্ষয়ক্ষতির সাথে জড়িত আছে আমাদের মানুষ, আমাদের জাত ভাই। তারা হলো রাজাকার। এই রাজাকার মিলিটারির সাথে হাত মিলিয়ে গ্রামের সব খবর তাদের কাছে বলে দিত। কোন বাড়ির লোক যুদ্ধে গেছে বা যাবে এসব খবর রাজাকাররা মিলিটারির কাছে পৌঁছে দিত। আর মিলিটারি তাদের বাড়িতে গিয়ে অনেক হামলা করত। তবু বুকে পাথর চাঁপা দিয়ে থাকতে হতো। অনেক কষ্ট সহ্য করে এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি বাংলার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছেন। দুই লাখ মা-বোন হয়েছেন নির্যাতিত। এ ছাড়া দেশের বিপুল সম্পদ নষ্ট হয়। যাঁরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার কাছে আমরা চিরঋণী। মুক্তিযুদ্ধে নয় মাস ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে আমরা সবাই একত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের এই জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেম সব সময় প্রয়োজন। আমরা স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করব। এ দেশকে সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধরূপে গড়ে তুলতে যার যার অবস্থান থেকে আমরা দেশ গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করব।

সূত্র : জ-৫৪০৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আরজু আক্তার	**সোনা মিয়া মুন্সী**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	গ্রাম: পুখুরিয়া মুন্সী বাড়ি, পোস্ট: পুখুরিয়া
৮ম শ্রেণি, গ শাখা	থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
	বয়স:৭০, সম্পর্ক: দাদা

ইশারা দিয়ে চলে যেতে বলল

সূত্র : জ-৫৪২৩

১৯৭১ সালে আমি দি ইঞ্জিনিয়ারর্স কোম্পানিতে চাকরি করি। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। ভোরে উঠে আমি নয়াবাজার গেলাম। গিয়ে দেখলাম দোকানপাট পুড়িয়ে ফেলেছে। দোকানপাটের ভেতরে দুই তিন জন লোক পুড়ে মরে আছে। আমি নয়াবাজার থেকে সদরঘাট চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম চারজন মিলিটারি, দুই জন বাঙালি। পেছন থেকে বাঙালি আর্মি দুজন আমাকে দেখল এবং চোখ দিয়ে ইশারা করে চলে যেতে বলল। আমি ইশারা পেয়ে সদরঘাটের পঞ্চাশ/ষাট ফুট পেছনে সরে গেলাম। ঠিক তখনই এক মিলিটারি আমার পেছনে তাকিয়ে গুলি করে দিল। আমার ডান সাইডের এক লোক গুলি খেয়ে পড়ে গেল। আশপাশের লোকজন শোরগোল শুরু করল। তখন আমি তাড়াতাড়ি করে সদরঘাট টার্মিনালে চলে গেলাম। টার্মিনালের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখি কেঁচিগেট গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আমি ভিক্টোরিয়া পার্ক ও জগন্নাথ কলেজের ভেতর দিয়ে কাঠের পুল হয়ে বাসায় এলাম।

বাসায় গিয়ে দেখি, আমার সাথের অন্য লোকেরা পালিয়ে গেছে। সেই রাত্রে কিছু গুলির শব্দ পেলাম। ভোরে উঠে নামাজ পড়তে গেলাম নারিন্দা সাভার বাড়ির মসজিদে। নামাজ শেষে ওই মসজিদের মুয়াজ্জিন বলল, আজ রাতে মিলিটারির একখানা জিপ এসে আমাদের গেটে হর্ণ দিল। তখন আমি উঠে গেটের কাছে গেলাম। আমাকে গেট খুলতে বলল। আমি গেট খুলে দিলাম। তখন জিপখানা ভেতরে প্রবেশ করল। প্রবেশ করার পর গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। তারা অনেক চেষ্টা করেও গাড়ির ইঞ্জিন চালু করতে পারল না। ওদের অফিসার বলল, তোমাদের বাড়ির মালিক কে? মুয়াজ্জিন বলল, এই বাড়ির মালিক পীর মুরশিদ। অফিসার ডাকতে বলল। আমি তাকে ডেকে আনলাম। অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করে, পীর মুরশিদ গাড়ি চালু হয় না কেন? পীর সাহেব বললেন, জুতা খুলে মাজারে গিয়ে জিয়ারত করেন। তারা পীর সাহেবের কথামতো মাজার জিয়ারত করে বের হয়ে আসল। তখন হুজুর গাড়ি চালু করতে বলল। হুজুর সেই গাড়িতে হাত দিয়ে ঠেলা দিল তারপর গাড়ি এমনি চালু হলো। তখন মিলিটারিরা হাত মিলাল। তারপর তারা ওখান থেকে চলে গেল।

পরের দিন সকালে হাটবাজার বন্ধ হয়ে গেল। আমরা কোনো কিছু কিনতে পারলাম না। আমাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সকালে উঠে দেখি নারিন্দা দয়াগঞ্জের প্রত্যেক গলিতে গলিতে একজন করে মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় সব মিলিয়ে সেখানে ১০০ মিলিটারি রয়েছে। আমাদের গেটে দুইজন মিলিটারি দাঁড়ানো। তখন আমি বাসায় ঢুকে গেলাম। মিলিটারিরা গেট পেরিয়ে আমাকে ধরে ফেলল। আমাকে বাসা থেকে বের করে আনল। তখন উর্দু ভাষায় বলল, তোমাদের ভয় নেই। আমাকে সাথে করে নিয়ে বাজারে গেল। আমাকে বলল, দোকানপাট খুলে দিতে বলো। আমি সবাইকে ডেকে বলে দিলাম, তোমাদের ভয় নেই। তারপর সবাই দোকানপাট খুলল।

চারদিন পর আমরা দেশে ফেরার জন্য রওনা হলাম। তখন দেখি রাস্তায় অনেক মানুষ মরে পড়ে আছে। কুকুর-কাক মানুষের লাশ খাচ্ছে। পনেরো বিশ দিন পরে আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম। তখন দেখি বুড়িগঙ্গার পাশ দিয়ে বিশ পঁচিশজন করে বান্ধা অবস্থায় পানিতে ভাসছে। বাসায় গিয়ে অফিসের কাজ করি। তখন আমাদের অফিসের সামনে একটি ট্রাকের ভেতরে পঞ্চাশ/ষাটজন লোক চোখবাঁধা অবস্থায় লাইন ধরে বসানো। ট্রাকটি ধোলাই খালে থামল। লোকজনকে সব ট্রাক থেকে নামাল এবং তাদের হাতের ভিতর দিয়ে রশি ঢুকিয়ে হাঁটুপানি পর্যন্ত নামিয়ে রাখল। সবাইকে বেয়নেট দিয়ে মেরে ফেলল। এভাবে কয়েক মাস চলতে লাগল।

একদিন আমাদের বাসার ওপর দিয়ে দুটো প্লেন ঘোরাঘুরি করতে লাগল। একটি প্লেনে গুলি লাগল। প্লেনের পাইলট নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য লাফ দিল। লোকটি জিনজিরা বাজারে পড়ল। তখন দুই তিনজন লোক এই পাইলটকে মেরে হাত ভেঙে দিল। অফিস থেকে আমি যখন বাসায় ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় আমার বাসার পাশের বাড়িগুলোতে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল এবং গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাত্রি শেষ হওয়ার পর সকালে উঠে পাশের অবস্থা দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমাল। আমিও সেই বাড়ির অবস্থা দেখার জন্য গেলাম। গিয়ে দেখলাম সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে অনেক নির্যাতনের মাধ্যমে মারা হয়েছে এবং বড় মেয়েদের নির্যাতন করে মারা হয়েছে। কয়েকজন লোক সেখানে মৃত অবস্থায় ছিল। আমি তা দেখে খুব মর্মাহত হলাম এবং তারপর গ্রামে চলে এলাম। গ্রামে এসে দেখলাম লোকজনের ওপর অনেক নির্যাতন করা হয়েছে ও অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ ভিটামাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি নিজ গ্রামের বাড়ি ফিরে দেখলাম, আমার বাড়িটাও পুড়িয়ে ফেলেছে। আমার বাড়িঘর দেখার জন্য একজন বুড়ো লোক ছিল। তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তখন এই অবস্থা দেখে আমার চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে এই নির্যাতনের অবসান ঘটতে লাগল। বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলল। যুদ্ধ করতে লাগল। তখন পাকিস্তানিদের অবস্থা খারাপ হয়ে এলো। এভাবে যুদ্ধ চলতে চলতে বাঙালি ফিরে পেল একটি স্বাধীন দেশ ও আমরা ফিরে পেলাম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

সূত্র : জ-৫৪০৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
জুথি আক্তারী	**মো. আনোয়ার খান**
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী	গ্রাম: ব্রাহ্মণকান্দা

টান টান হয়ে শুয়ে থাকতাম

আমি তখন চাকরি করিতাম চিটাগাংয়ে আমিন জুট মিলে। তখন রাত দশটা। পাকসেনা যুদ্ধের ঘোষণা দিল। আমিসহ বহু লোক এক সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। পথে গুলির আঘাতে অনেক লোক মারা যায় আমার সামনে। পথেঘাটে কত ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করত। আমি টিচাগাং থেকে তিন দিন পর ফেনীতে পৌঁছালাম। তখন একটা হাই স্কুলে বহু লোক অন্ধকারে রাত কাটায়। অনাহারে মানুষের জান বাঁচে না। তখন গ্রাম থেকে রুটি আলু সিদ্ধ করিয়া আমরা খাইয়া দিন কাটাইতাম। ওখান থেকে চার দিন হাঁটিয়া আসিলাম চাঁদপুর। ওখানে কোনো লঞ্চ পাইলাম না। দুদিন অনাহারে দিন কাটাই। তারপর ঢাকা থেকে লঞ্চ আসিয়া চাঁদপুর পৌঁছায়। তখন ওই লঞ্চে উঠে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছালাম। আমার হাত-পা ফুলিয়া গেল। হাঁটার কোনো কায়দা ছিল না। বহু কষ্ট করে তিন ঘণ্টায় ফরিদপুর পৌঁছালাম। তখন আমার হাতে একটা পয়সা ছিল না। বাসওয়ালাদের অনুরোধ করিয়া বাড়ি পৌঁছলাম। তখন ফরিদপুর জেলায় পাকসেনা এসে পৌঁছায় নাই। বাড়ি আসার পাঁচ দিন পর ফরিদপুর পাকসেনা হামলা চালায়। বাড়ি এসেও বেশিদিন থাকতে পারি নাই। তাদের অন্যায় অত্যাচারের জন্য বাড়ি ছেড়ে অনেক জায়গায় লুকিয়ে থাকতে হয়। পাশের গ্রামে ছিল হিন্দুরা। তাদের মারার জন্য পাকিস্তানিরা অনুমতি দেয়। তখন হিন্দুরা আমার বাড়ি এসে আশ্রয় নেয়। মানুষের মুখে শুনি যেখানে-সেখানে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে তামা করে দেয় এবং উঠতি বয়সের মেয়েদের অত্যাচার করে। মা-চাচি কাউকে মানেনি তারা। তখন আমরা ঠিকমতো পেটে ভাত দিতে পারি নাই। আমরা কোলের শিশু নিয়ে ঝোপে পালিয়ে ছিলাম। যখন আমরা গুলির শব্দ শুনতাম তখন জয়ার পাশ দিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে থাকতাম যাতে আমাদের গুলি না লাগে।

আমাদের বাড়ির পাশে ছিল মধু শরিফ। সে যখন রাতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেতে বসেছিল, তখনই পাকিস্তানিদের লোক এসে তাকে ঘর থেকে বের করে একটা ভিটার ওপর নিয়ে এক গুলিতে মেরে ফেলল। তখন ভয়ে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমরা ভয়ে অন্য গ্রামে চলে যেতাম। কিছু দিন পর শুনি এ দেশে যত হিন্দু ছিল তাদেরকে ধরে মুসলমান বানাবে। তারা প্রাণের ভয়ে গরু জবাই করে তাদের দেখাত। মেয়েদের ধরে নিয়ে যেত এবং অসংখ্য দামাল ছেলেদের গুলি করে হত্যা করত। আমাদের এলাকা কয়েক সপ্তাহ ভালো ছিল। তারপর শুনি বড় বড় নেতাদের মেরে ফেলতেছে। আমাদের গ্রামে ছিল রাজাকার। রাজেক মেম্বার একদিন সে মাছ ধরতে গিয়েছিল ফাজিলপুর। রাস্তায় তখন সে দেখে নৌকায় চড়ে কয়েকজন লোক আসতেছে। তখন তার মনে সন্দেহ হলো যে তারা রাজাকার। তখন সে তাদের দিকে খেয়াল করে দেখল যে, তারা তার দিকে আসতেছে। সে তাদের আসা দেখে বাড়ির দিকে রওনা দিল। যখন সে বেশি হাঁটে তখন তারাও বেশি করে হাঁটে। তাদের হাঁটা দেখে সে দৌড় দেয়। তারাও দৌড় দেয়। তখন রাস্তার পাশে ছিল একটা বট গাছ। সে সেখানে এসে দেখে একটা নৌকা ভেড়ানো। তখন সে জানের তিরাসে কিছু না পেয়ে হাত দিয়ে পানি টেনে নৌকা চালিয়ে গিয়ে

উঠল একটা বাড়িতে। তারাও তার পেছনে পেছনে এলো এবং নৌকা নিয়ে তারা সেই বাড়ি গিয়ে উঠল। সেই বাড়ির লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করল যে, এই বাড়ি রাজেক মেম্বার এসেছে, তাকে কোথায় লুকায়ছিস? তাড়াতাড়ি বের করে দে, তা না হলে তোদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিব। তখন তারা মিথ্যা কথা কয়ে তাদের পাঠিয়ে দেয়। এ রকম করে চলল অনেক দিন।

আমরা তখন ক্ষুধায় অনেক কষ্ট করতাম। কোনো হাটবাজার মিলত না, যে কোনো সময় রাজাকাররা এসে জ্বালিয়ে দেবে সেই ভয়ে ঠিকমতো বাজার মিলত না। কেউ যদি কিছু নিয়ে আসত তাহলে মানুষ কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যেত। একদিন আমার মা আমাকে বলল, বাবা টাকা নিয়ে যা কিছু চাল কিনে নিয়ে আয়। তখন আমি গেলাম পুরায়দা হাটে, গিয়ে দেখি কোনো চাল নেই। একটা বেটা কিছু চাল আনছিল তা বেচা হয়ে গেছে। তখন তাকে অনেক অনুরোধ করে বললাম, চাচা আপনার বাড়িতে চাল আছে। তাহলে আমাকে কয়েক সের চাল দেন। তখন সেই বেটা তার বাড়ি নিয়ে ১০ সের চাল দিল আমাকে। আমি সেই চাল বাড়ি নিয়ে আসি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভাত রান্না করে খাই রাত ৯টার সময়। সে চাল দিয়ে দুই তিন দিন চলে যায়।

তারপর শুনি হিন্দুরা এ দেশ ছেড়ে ভারত চলে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ির পাশে যে হিন্দুরা ছিল তারা তাদের জমি-জমা, মালগুলো আমাদের কাছে রেখে গেল। যেমন: চাল ডাল গম ইত্যাদি জিনিস দিয়ে তারা বলে গেল– আমরা যদি কোনো দিন আসি তাহলে জিনিসপত্রগুলো দিয়ে দিও। যদি না আসি তাহলে তোমরা জিনিসগুলো রেখে দিও। তার কিছু দিন পর আমার বড় শালা আমাদের বাড়ি আসে। একদিন সে বাজারে গেলে পুখুরিয়া বাসস্ট্যান্ডে পাকিস্তানি লোকেরা এসে তাকে গুলির অর্ডার দিল। তাকে নিয়ে একটি ঘরের ভেতর আটকিয়ে রাখল। তার হাতে ছিল সরকারি একটি কার্ড। কার্ডটির কারণে তাকে ছেড়ে দিল। সে বাড়ি এসে আমাদের কাছে বলল, তখন আমরা হতাশ হয়ে গেলাম। তারপর আমরা রেডিওতে শুনলাম ভারতে বাংলাদেশের মানুষ গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। তারপর আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করি।

সূত্র : জ-৫৪৩১

সংগ্রহকারী:
ইচমা আক্তারী
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী
৯ম শ্রেণি, মানবিক শাখা

বর্ণনাকারী
মো. হালিম সেখ
গ্রাম: খাকান্দা নাজিরপুর
থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
সম্পর্ক: বাবা, বয়স: ৬৫

একজন ছিল গর্ভবতী

একটি সত্য কাহিনী বর্ণনা করছি মো. মোচন ফকিরের নিকট থেকে শুনে। যে ছিল একজন গরিব কৃষক। তাকে অন্যের ক্ষেত খামারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। তাই কাজ

করার উদ্দেশ্যে শ্রীপুর থানা যশোর জেলায় যায়। সে এক বাড়ি রোজ মাইনা চুক্তি করে কাজ শুরু করে। মালিকের নাম ছিল গোহুর। সে ছিল খুব ভালো মানুষ। মালিকের অনেক জমি ছিল। একদিন সকালবেলা সে জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে গেল। জমির কিছু দূর দিয়ে রাস্তা, মালিকের বাড়ির পাশ দিয়ে ছিল পানি। পানি পার হওয়ার জন্য ছিল নৌকার ব্যবস্থা। যখন যে জমিতে ধানের চারা রোপণ করছিল তখন রাস্তা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় তাকে তারা দেখে ফেলে। পাকিস্তানের হানাদার বলে ও মুক্তি ওকে গুলি করবো তখন এক রাজাকার বলে, স্যার ও মুক্তি না। ও সত্যিকার একজন কৃষক। তখন পাকিস্তানের হানাদাররা বলে এই বাঙালি এধারমে আয়, কাছে আয়। কিন্তু সে তাদের কাছে না যেয়ে সেখান থেকে দৌড়িয়ে কিছু দূর এসে নৌকায় ওঠে মালিকের বাড়ি যায়। আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাকে গুলি করে না। তারপর সে বাড়ি গিয়ে সবাইকে জানায় যে, পাকিস্তানের সৈন্য এদিকে আক্রমণ করছে, আপনারা তাড়াতাড়ি পালান। তারা তখন নৌকায় ওঠে পাকিস্তানিরা যেদিক দিয়ে আসছিল তার বিপরীত দিক দিয়ে বাড়ি থেকে পালায়। এক গ্রামের পাশে নৌকা রেখে দৌড়াতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন ছিল গর্ভবতী। সে অন্যদের সাথে দৌড়াতে পারে না। ধানের জমির ভিতর দিয়ে দৌড়াতে হয়েছিল। তখন কৃষকরা তাদের জমির ধান কেটে ফেলছিল। ধানের গোড়ায় লাগতে লাগতে এক সময়ে গর্ভবতী মহিলার পরিধানের কাপড় কোথায় রয়ে যায় সে জানে না। এক সময়ে জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে যায়। তার ওই অবস্থা দেখে কৃষাণ তার নতুন বড় গামছাটি তাকে দেয় এবং উঁচু করে ধরে পাশের এক হিন্দু বাড়ি নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার কিছু সময় পর ওই গর্ভবতী মহিলার প্রসব হয় এবং একটি ছেলে হয়। তারপর তারা তিন দিন পর্যন্ত ওই বাড়িতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা ওই এলাকায়ই ছিল। খামার পাড়ার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার আকবর চেয়ারম্যান তার মুক্তিবাহিনীর সৈন্য দল নিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করেন এবং তারা তখন সেই এলাকা থেকে পালায়। তারা খাসি জবাই করে আনন্দ করে খাবে বলে রান্নাবান্না করছিল। কিন্তু তাদের সেই সুযোগ হলো না।

এভাবে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করার পর এ দেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : জ-৫৪৪০

সংগ্রহকারী
মো. মিনহাজ হোসেন
ব্রাহ্মণকান্দা এ এস একাডেমী
দশম শ্রেণি, রোল:০৮
ব্যবসায় শিক্ষা শাখা

বর্ণনাকারী
মো. মোচন ফকির
গ্রাম: লক্ষ্মীপুর, পোস্ট: ফাজিলপুর
থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর
সম্পর্ক: দাদা, বয়স: ৬০

হরিদাশকে হত্যা করা হবে

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে ভয়ানক এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। আমার জন্ম হয়নি। আমি তার বহু বছর পর জন্মগ্রহণ করেছি। তাই আমি যুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে আমি অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পেরেছি। তারপর আমি কৌতুহলী হলাম। বাড়ি এসে

যারা যুদ্ধ দেখেছে তাদের কাছে অনেক কিছু জানতে চাইলাম। তারা যুদ্ধ বিষয়ক অনেক কিছু আমাকে বলল। সেই ঘটনাগুলো শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমার মনে হলো, আমাদের দেশের মানুষ এত কষ্ট করেছে! তারা এমন অকথ্য দুঃখবরণ করেছে! তাদের কথা মনে পড়লে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি যে ঘটনাগুলো তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি সেই সত্য এবং নির্মম ঘটনাগুলো নিচে লিখেছি।

এই ঘটনাটি আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি। যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন সবাই যার যার প্রাণ বাঁচানোর জন্য যেসব গ্রামে যুদ্ধের উপদ্রব কম সে সব গ্রামে আশ্রয় নিতে লাগল। কুষ্টিয়ার মিল লাইনে তখন যুদ্ধের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল। তাই সেখানকার লোকজন অন্যান্য গ্রামে চলে যেতে লাগল। সে সময়ে সেই গ্রামে হরিদাশ নামে একজন লোক বাস করত। তার ছিল পাঁচ ছেলেমেয়ে। মেয়ে দুটো ছিল বড়। তাই মেয়ে দুটোকে সসম্মানে বাঁচানোর জন্য ওদের মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হলো। আর তিন ছেলে নিয়ে সে মিল লাইনেই থেকে গেল এবং আতঙ্কের মধ্যে জীবন-যাপন করছিল। একদিন তার ঘরের পাশ দিয়ে পাকবাহিনী যাচ্ছিল। তার ছোট ছেলেটার বয়স তখন ৩ বছর। তিন বছরের এই ছোট ছেলে দেখল তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে পাকবাহিনী যাচ্ছে। সে এসে তার বাবাকে বলল। তার বাবা সত্য কিনা তা জানার জন্য উঁকি মেরে দেখতে গেল। তখন একজন পাকিস্তানি সৈন্য তাকে দেখে ফেলল। তাকে দেখে সৈন্যটি দাঁড়াবার জন্য হাত উঁচু করল। কিন্তু সে সেটা বুঝতে পারল না। সে ভাবল, কেউ তাকে দেখেনি। কিন্তু একটু পরেই পাকবাহিনী এসে তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলল এবং দরজায় কড়া নাড়তে লাগল। তার স্ত্রী ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এলো। পাকবাহিনী বলল, ঘরে কে? বের করে আনো। তার স্ত্রী বলল, ঘরে কেউ নেই। শুধু আমার ছোট তিনটা ছেলে আছে। পাকবাহিনী ঘরে ঢুকে তার স্বামীকে খুঁজে বের করে নিয়ে আসল এবং দরিয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে বলল। তার স্ত্রী ও সন্তান বুঝল যে, নদীতে নিয়ে গিয়ে হরিদাশকে হত্যা করা হবে। সে ও তার স্ত্রী পাকবাহিনীর পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে অনেক কান্নাকাটি করল। কিন্তু পাকবাহিনীর সৈন্যরা কিছুই শুনল না। তারা বলল, কোনো অসুবিধা নেই। শুধু আমাদের দরিয়ার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে বলুন। তখন হরিদাশ তাদের সাথে গেল। কিছুদূর যাবার পর তার স্ত্রী গুলির আওয়াজ শুনতে পেল এবং বুঝতে পারল যে, তার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। সে ভাবল এখন আর তার এখানে থাকা উচিত হবে না। পাকবাহিনী তার স্বামীকে হত্যা করে চলে যাওয়ার পর সে নদীর তীরে তার স্বামীর লাশটা ধরে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে খেয়াল করল বুটের শব্দ। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে অনেকগুলো তরুণ-যুবককে নিয়ে পাকবাহিনী এদিকেই আসছে। নদীর তীরে ঘন একটা বন ছিল। তারা ওই বনের ভিতর গিয়ে লুকাল। আর লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল সেই তরুণ যুবকগুলোকে পাকবাহিনী একটা লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলিবর্ষণ করল। গুলিতে সবগুলো যুবক মারা গেল। এ নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখে সে স্থির থাকতে পারল না। বনের ভিতর দিয়ে অন্য গ্রামে চলে গেল।

সূত্র : জ-৫০৪৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তিথী ভঞ্জ	**সতী ভঞ্জ**
কামারখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: মছলন্দপুর, থানা: মধুখালী,

ষষ্ঠ শ্রেণি, রোল: ৩ | জেলা: ফরিদপুর
সম্পর্ক: মা, বয়স: ৫৫

নতুন ধরনের নির্যাতন

আমি বিথী দত্ত। কামারখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বয়স ১২ বছর। আমাদের স্কুল থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার (বাস্তব) ঘটনা লেখার জন্য বলেছে। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আমাদের জন্মের অনেক পূর্বে সেহেতু আমি আমার মা-মাসিদের কাছে শোনা গল্পের আংশিক কথা লিখলাম:

১৯৭১ সাল। আমার মা তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তিনি পাবনা শহরে লেখাপড়া করতেন। হঠাৎ ২৫ মার্চ ভোর ৫টার সময় প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। প্রথম অবস্থায় কেউ বুঝতে পারে নাই যে, কী ঘটেছে। সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে লোকজন শুধু ছোটাছুটি করছে। সবার মুখেই এক কথা, মিলিটারি এসেছে। তারা বাঙালি দেখলেই গুলি করছে। ঘর থেকে বের হবার উপায় নেই। চারদিক থেকে শুধু গোলাগুলির আওয়াজ। এভাবে দুই দিন গৃহে বন্দি অবস্থায় থাকার পর ২৮ মার্চ আমার মা বড় মাসিদের সাথে (আমার মা মাসিদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করতেন) পাবনার বাসা থেকে সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে রওনা দেন। অনেক হেঁটে এবং অনেক পথ ঘাট পেরিয়ে রাজাপুর নামক একটি গ্রামে এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানেও একই পরিস্থিতি। যাই হোক পরের দিন ভোর ৬টার দিকে পুনরায় হাঁটা শুরু করেন। মাথার উপরে উড়োজাহাজের ঘোরাঘুরি নিচে গোলাগুলির শব্দ। জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। এমতাবস্থায় সারাদিন হাঁটার পর বিকেল ৫টার দিকে এক অজপাড়াগাঁয়ে আশ্রয় নেন। সারাদিন না খাওয়া এবং হাঁটার কারণে সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

ওখানে দুই দিন অবস্থান করার পর আমার মা দাদুর গ্রামে খবর পাঠালেন। আমার দাদু গরুর গাড়ি নিয়ে এসে তাদেরকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে যাবার পর বেশ কয়েকদিন ভালই ছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন যাবার পর শুরু হলো নতুন ধরনের নির্যাতন। একদিকে পাকিস্তানি মিলিটারি অপর দিকে গঠিত হলো রাজাকার, আলবদর বাহিনী। প্রতি রাতেই ডাকাতি হওয়া শুরু হলো। এক রাতে এক বাড়িতে ডাকাতিকালে ডাকাতরা ওই বাড়িতে আসা এক আত্মীয়ের মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। আমার মাসিরা রাতে বাড়িতে থাকতে পারতেন না। কখনো নৌকাতে করে সারা রাত নদীর ধারে পাট ক্ষেতে, কোনো রাতে জংগলের ভিতরে বসে রাত কাটাতে লাগলেন। সেটাও পরে আর সম্ভব না হওয়ার একদিন সব কিছু ফেলে খালি হাতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে রওনা দিলেন।

ভারতে যাওয়ার পথে শত শত বাধা। কোথাও রাজাকাররা পথ আটকে দিয়ে টাকা দাবি করে, কোথাও বা দাঁড় করে রাতটা থেকে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করে। পথে যেতে যেতে কত যে মানুষের লাশ দেখতে পান তার শেষ নেই। কত মা তার কোলের বাচ্চা ফেলে চলে গিয়েছে শুধু নিজের জীবনের মায়া করে। যেসব কথা শুনলে এখন আমাদের গা শিউরে উঠে। এসব বহু বাধা পেরিয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখেন। সেখানে গিয়ে ভারত সরকারের দেওয়া শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। কোনো রকমে দুটো ডালভাত খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। এদিকে বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। এভাবে ৯ মাস ভারত সরকারের সহযোগিতায় যুদ্ধের

পর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমার মাসিরা মনের আনন্দে তাদের জন্মভূমি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সূত্র : জ-৫০৭৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
বিথী দত্ত	**মালতী রানী দত্ত**
কামারখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক: মা, বয়স: ৪৬
৭ম শ্রেণি, রোল:১৮	গ্রাম: মছলন্দপুর

আমিও আর জিজ্ঞাসা করিনি

আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকেই শহীদ হয়েছেন। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীনতা। আমার তোমার একটু সুখের জন্য যারা রক্তের নদীতে ভেসেছেন। তাদেরকে কখনো ভুলবার নয়।

আমি এখন যার মর্মান্তিক মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করব তিনি আমার কাকির ভাই অর্থাৎ আমার মামা। চিনতে ও জানাতে নিচে স্থানের নাম উল্লেখ করলাম।

গ্রাম: আটরশি, থানা: সদরপুর, জেলা: ফরিদপুর

তাঁর নাম বিষ্ণু বনিক। তাঁর বাবার নাম ছিল মধুসূধন বনিক। তার মাতার নাম মলিনা প্রভা বনিক। তাঁর এই অকাল মৃত্যু কাহিনী বলতে গিয়ে আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। তবু আমাকে এটা বর্ণনা করতে হবে।

মৃত্যুর তারিখ ও ঘটনা:

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তখন তার বয়স হবে ১৮/১৯। তিনি সেই দিন বাজার করতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাকবাহিনী তাকে মুক্তিবাহিনী মনে করে পেছন থেকে গুলি বর্ষণ করে। গুলিটি তার কানের সামান্য দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভয়ে এবং গুলির শব্দে মাটিতে তিনি পড়ে গেলেন। তখনও তার জ্ঞান ছিল। তিনি তখন চোখ মিটিমিটি করে তাকিয়ে তাদেরকে দেখছিলেন। পাকবাহিনী ভেবেছিল নিশ্চয় সে মারা গেছে। তাই তারা চলে যাচ্ছিল। তখন বিষ্ণু মামা মাটি থেকে উঠে দৌড় দিয়েছিলেন। আর তখন পাকবাহিনী বুঝতে পেরে বিষ্ণু মামাকে লক্ষ্য করে পুনরায় গুলি করে। একটা গুলি পেটের মধ্যে বিঁধে গেল। মামা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তিনি আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর বিষ্ণু মামা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের মায়া-মমতা ত্যাগ করে চিরদিনের মত ইহলোক ত্যাগ করলেন। তখন আটরশি গ্রামে জানাজানি হয়ে গেল যে, মধুসূদন বনিকের ছেলে বিষ্ণু বনিক পাকবাহিনীর গুলিতে মারা গেছেন। আরও দুঃখের বিষয় ছিল যে, তাঁর আত্মীয় স্বজন তাঁর অকাল মৃত্যুতে একটুও শোক প্রকাশ করতে পারলেন না। বিষ্ণু মামার রক্তসিক্ত লাশ ফেলে রেখে তাঁর পরিবার বর্গ আত্মরক্ষার জন্য অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁর নিষ্পাপ দেহ শেয়াল-কুকুরে খেতে লাগল। আমার কাকামনির ভাই বিষ্ণুর কথা বলতে গেলে তার দুই চোখ অশ্রুতে ভিজে যায়। আমিও আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিনি।

নদী যেমন মোহনায় এসে পিছনের পথটাকে ভুলতে পারে না। তেমনি আমরাও এখন স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু ভুলে যাব কি করে বিষ্ণু আর বিষ্ণুর মত যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দিয়েছে তাদের কথা!

আমি বহুবার আমার কাকিমার কাছ থেকে বিষ্ণু মামার গল্প শুনেছি। আমি যে অন্যদেরকেও বিষ্ণু মামার গল্প শুনাতে পারবো তা আমি কখনো ভাবিনি।

সূত্র : জ-৫০৮৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শুক্লা দত্ত	**অনিমা দত্ত**
কামারখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: +পোস্ট: কামারখালী
৮ম শ্রেণি, রোল: ৩	থানা: মধুখালী, জেলা: ফরিদপুর
	বয়স: ৪৫, সম্পর্ক: কাকী

দুটো ডগা খাড়া হয়ে আছে

আজ ৮ সেপ্টেম্বর। আজ আমি লিখছি মুক্তিযুদ্ধের কিছু বাস্তব ঘটনা। ৬-৯-০৬ তারিখে আমাদের স্কুলে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গাড়ি এসেছিল। সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু দেখলাম। কিন্তু আনন্দের পাশাপাশি এর পেছনে লুকিয়ে ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই ভয়াবহ ঘটনা আমি দেখিনি। কিন্তু কারো মুখে শুনলে ভয়ে গা ছমছম করে। ছয় তারিখে সেই মুক্তিযুদ্ধের কিছু প্রামাণ্য চিত্র দেখে খুবই খারাপ লাগল। কত অসহায় মা, ভাই ও বোনেরা জীবন দিল। তাদের কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের স্যাররা বলেছিলেন যে, আমাদের বাড়ির আশেপাশে যে সকল মুরুব্বি অথবা দাদা-দাদি আছেন তাদের কাছ থেকে কিছু বাস্তব ঘটনা শুনে লিখে পাঠাতে হবে। আমাদের লেখা নাকি তাঁরা রেখে দিবেন। এ কথা শুনে আমার ভাল লাগল। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, কার কাছ থেকে শুনব সেই স্মৃতিময়, দুঃখভরা মুক্তিযুদ্ধের কথা। আমার সৌভাগ্য যে, বাড়ি গিয়ে দেখি আমার নানি এসেছে। আমি তখন নিশ্চিন্ত হলাম। রাতের বেলায় আমি নানিকে বললাম মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে।

নানি বললেন, সে এক দুঃখময় ঘটনা। যখন পুরোপুরি যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমার মার তিন মাস বয়স। নানি আমার মাকে নিয়ে তাঁর মায়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। নানি আরো একটি দুঃখের কথা বললেন যে, তার ছেলে আর তার জামাই নাকি কাদের সঙ্গে ভারতে চলে গিয়েছিল। এই খবর শুনে আমার নানি দিনরাত শুধু কেঁদে বেড়াতেন। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত যে, তোমার ছেলে জামাই ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না। একদিন একজন লোক নানিকে বলেছিল যে, তুমি ভাত রান্না করার সময় ভাতের উপর কুমড়ো শাকের ডগা কেটে দেবে। যদি দুটি ডগা খাড়া হয়ে থাকে তাহলে বুঝবে যে, তোমার ছেলে ও জামাই দু'জনেই বেঁচে আছে। নানি তাই করলেন। দেখলেন দুটো ডগা খাড়া হয়ে আছে। তিনি ভাবলেন, হয়ত তারা বেঁচে আছে। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল, তারা আর ফিরে আসলেন না। শেষে দুই মাস পর একদিন রাতের বেলায় তারা আসলেন বাড়িতে। তাদের চেহারা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তারপর আমার মামা ও খালু বলেছিলেন যে, তারা কিভাবে কোথায় ছিলেন।

তারা নাকি যাওয়ার সময় ধরা পড়েছিলেন। ধরা পড়ার পর তাদেরকে জেলে আটকে রাখল। প্রতিদিন একটি করে পোড়া রুটি খেতে দিত। আমার মামা খেত। কিন্তু খালু খেতেন না। একদিন তারা দেখলেন যে, ওই সকল মানুষরা জেলের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলছে। এই ঘটনা দেখে মামা ও খালু ভীত হয়ে পড়লেন। তাদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সবার শেষে তাদেরকে জেল থেকে বের করা হলো। তারা ভাবলেন যে, এখনি তাদের জীবন শেষ। আমার মামা ও খালুকে গুলি করবে, এমন সময় তারা বলল যা, তোদেরকে আর মারব না। এই বলে এক ধাক্কায় ফেলে দিলো। কিন্তু তারা বাড়ি আসবেন কিভাবে? তাদের কাছে কোনো টাকা পয়সা নেই। তারা ফিরে গেলেন সেই লোকটার কাছে। গিয়ে বললেন, স্যার এতটুকু দয়া যখন করলেন আর একটু দয়া করুন, আমাদের বাড়ি পৌঁছার জন্য কিছু টাকা দিন। তখন সেই লোকটার মনে একটু দয়া হলো। সে একটা কার্ড দিল। বলল, এই কার্ড দেখালে যেতে দেবে। তারপর মামা ও খালু সেই কার্ড দেখিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

তারপর দেশ স্বাধীন হলো। নয় মাস ধরে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হলো তার বিনিময়ে বাঙালিরা পেল স্বাধীনতা। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের অনেক কিছু মনে করিয়ে দিল এবং আমরা এ থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। তাই যারা এত কাছ থেকে বিনা খরচে মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কিছু দেখালেন তাদের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা। আর শ্রদ্ধা রইল সেই মা, ভাই ও বোনদের জন্য যারা জীবন দিলেন দেশের জন্য। তাদের এই মহান আত্মত্যাগের কথা আমরা কোনোদিন ভুলব না।

সূত্র : জ-৫০৯৪

সংগ্রহকারী
মিনু খাতুন
কামারখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
নবম শ্রেণি, রোল:৭

বর্ণনাকারী
চন্দর বেগম
গ্রাম: বারিয়াকান্দি
বয়স: ৬৩,সম্পর্ক: নানি

রক্তের মত পানি

১৯৭১ সালের সেই স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একটি ঘটনা মাঝে মাঝে আমার মনে উঠলে আজও বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠে। সে এক ভাদ্র মাসের রবিবারের দিন। তখন রবিবারেই সাপ্তাহিক হাট বসে বোয়ালমারীতে। বহু দূর দূরান্ত ও আশপাশ দিয়ে প্রায় পনেরো বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়ে থাকে এই হাটে। আমার দোকান আছে এই হাটে। আমি ঢেউটিন ও পাটের ব্যবসা করি। আমার আব্বা তখনও বেঁচে আছেন। আমার আব্বা পাট কিনছে, আমি টিনের ক্রেতাদের সাথে কথা বলছি, তখন পুরোভাবে হাটে কেনাবেচা শুরু হয়েছে।

এর মধ্যে খবর হয়ে গেল যে, নদী পথে লঞ্চে করে মিলিটারি আসছে। এই খবর পেয়ে হাটের মানুষ দিগবিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। ফুটপাতের দোকানগুলি লুটপাট ও পায়ের চাপায় নষ্ট হয়। এদিকে আমার আব্বা বললেন, মনি তুমি বাড়িতে চলে যাও। তিনি সাহস পেলেন না

আমাকে দোকানে রাখতে। আমি দেরি না করে বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম। তখন পুরা বর্ষাকাল। বাড়ি আসতে বহু পথ ঘুরে আসতে হয়। সোজা পথে পানি। হাজার হাজার মানুষ ভয়ে যার যার সুবিধা মত দৌড়াচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। আমিও বিরামহীনভাবে দৌড়াচ্ছি। রেল স্টেশনে এসে দক্ষিণ লাইনের পাশ দিয়ে দৌড়াচ্ছি। কিন্তু পায়ে আর কুলাচ্ছে না। সামনে পিছনে আমার মতই হাজার হাজার মানুষ। কিছু বয়স্ক লোক বসে পড়ছে আবার ওঠে দৌড়াচ্ছে। এক সময় বাড়ির থেকে একটু দূরে লাইন গেটে এসে গেলাম। ওখানে দাঁড়ায়ে ভাবলাম আরও একটু এগোয়ে বাড়ির থেকে নৌকা ডেকে কাপড় না ভিজিয়ে নৌকায় চলে যাবো। এর মধ্যে দেখি সামনের থেকে লোকজন পিছনের দিকে দৌড়িয়ে আসছে। তারা বলছে, চিতাখাটা লঞ্চ ভিড়ায়ে মিলিটারি আমাদের দিকে আসছে। তখন পানি ভেঙে বাড়িতে আসলাম। আমাকে দেখে সকলে কান্নাকাটি শুরু করল। আমাকে বলছে, তোরা কোথাও চলে যা। যদি মিলিটারি বাড়িতে আসে তবে তোকেই তো আগে মারবে। দৌড়ায়ে নৌকার কাছে গেলাম। দেখি নৌকা পানিতে ভর্তি। পানি সেচতে লাগলাম। হঠাৎ বাড়ির পিছনের দিকে গুলির আওয়াজ। পূর্ব দিকেও গুলির আওয়াজ। দৌড়ে বাড়ির ভিতরে গেলাম। আবার কান্নাকাটি। আমার চাচি এসে বলল, বজলুদের বাড়ি থেকে দুইজন মিলিটারি আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আমার ফুফু আমাকে একটা বেতের ডালা দিয়ে বলল, ডালাটা মাথায় দিয়ে ওই কচুড়ির আড়ালে পালিয়ে থাক। আমি পায়খানার আড়ার ভিতর দিয়ে কচুড়ির আড়ার ভিতর চলে গেলাম। বড়বড় কচুড়ি, লুকাতে অসুবিধা হলো না। মাঝে আবার বৃষ্টিও হয়ে গেল। শীতে মারা যাওয়ার অবস্থা। পরে আবার রোদও হলো। আটা কচুড়ি পাছার নিচে দিয়ে কোনো রকম পানির উপরে ভেসে থাকলাম। প্রায় ঘণ্টা আড়াই পরে লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। পরে আর একটি লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার শব্দ পেলাম। মনে মনে ভাবলাম মিলিটারি হয়তো চলে গেল। আড়ার কিছু দূরেই ছোট একটি হালট। ফেলু মোল্লা নামের লোকটা বলতে বলতে যাচ্ছে, মিলিটারি চলে গেছে। আমি বের হয়ে আসতেই দেখি কচুড়ির ভিতরে আরও অনেকেই ছিল। ভয়ে কেউ নড়াচড়া করে নাই। বাড়িতে এলাম। তবু মনে হচ্ছে যেন এখনও মিলিটারি যায় নাই। ভয়ে ভয়ে বাড়ির ওপর দিয়ে পানি ভেঙে রেল লাইনে উঠলাম। দেখি বৃদ্ধ গনি মুন্সী মরে পড়ে আছে দুই লাইনের মধ্যে। তার মেয়ে কাঁদছে পাশে বসে। একটু এগিয়ে দেখি ঐ লাইনের মধ্যেই পড়ে আছে চতুল গ্রামের একজন বৃদ্ধ মাস্টার। তার কলিজা দেখা যাচ্ছে এবং মাটিতে রক্ত জমাট বেধে আছে। ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে আর কিছুদূর যেয়ে দেখি হালিমের ঘরের ডোয়ার সাথে মোসলেম। ওখান থেকে পাঁচ ছয়টা বাড়ি পার হতেই হালটের উপর রক্তের মত পানি। ডাইনে তাকাতেই দেখি দদু মিস্ত্রির ঘরের দরজার সামনে আজিত ফরাসি লোকটা মরে আছে। কিছু দূর যেতেই দেখি আমার চাচাত ভাইয়েরা দুই ভগ্নিপতিসহ বাড়ির দিকে আসছে। ওরা পাশের গ্রামে পালিয়ে ছিল। মিলিটারি চলে গেছে বলে ফিরে আসছে। বললাম, মিলিটারি যায় নাই। ওরা হেসে বলল, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে হাট থেকে ফিরে আসা লোক বলল, মিলিটারি চলে গেছে। তখন বাড়ি ফিরে এলাম। শুনলাম বোস বাড়ির খেপা বোসকে গুলি করেছে। ইসহাকের আব্বা নৌকায় পালাচ্ছিল, সেও গুলিতে মারা গিয়েছে। লাইনের ওই পাড়ে মালেক মারা গিয়েছে। বাড়ির পিছনে হোসেনের ছেলে চান মিয়াকে বাড়ির সকলের সামনে উঠানে গুলি করে মেরেছে। বাইখিরের রাজা নামের এক বিড়ি বিক্রেতাকে আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশে রাস্তার

উপরে গুলি করেছে। পাশেই তার সদাইয়ের ব্যাগ। দেখতে পেলাম ব্যাগের ভিতর সদাই পত্র। কিছু ছোট মাছ, দুই খানা বিস্কুট কাগজ দিয়ে পেঁচান।

আমার চোখ দিয়ে পানি আসলো, ভাবলাম হয়তো দুইখানা বিস্কুট তার ছোট ছেলেমেয়ের জন্য কিনেছিল। মাত্র দুই বর্গ মাইলের ভিতরেই বিনা কারণে এতগুলি তরতাজা মানুষের রক্ত মাটির সাথে মিশিয়ে দিল পাকহানাদার ও বাংলার বেঈমান রাজাকার বাহিনী। এমনি করে লাখো মানুষের রক্ত ও মা বোনদের ইজ্জত দিয়ে স্বাধীন হলো এই বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ আজ ভোগ করছে জুলুমবাজ, অত্যাচারী ও বিত্তবানেরা আর বঞ্চিত হচ্ছে বেশিরভাগ অত্যাচারিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষ।

সূত্র : জ-৫৪৫৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
নিতু চৌধুরী লাবণ্য	**মো. লুৎফার রহমান চৌধুরী**
বোয়ালমারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: ছোলনা (চৌধুরী বাড়ি)
১০ম শ্রেণি, রোল: ২৩	পোস্ট+থানা: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর
	সম্পর্ক: বাবা

যুহর বিশ্বাস

কলিমাঝি গ্রামে যুহর বিশ্বাস নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তারা ছিল দুই ভাই এক বোন। বড় জনের নাম যুহর বিশ্বাস, ছোটজনের নাম ফজর বিশ্বাস ও বোনের নাম আমিনা। যুহর বিশ্বাসের একটি মেয়ে ছিল। যখন যুহর বিশ্বাস যুদ্ধে যান, তখন তার কন্যার বয়স ছিল মাত্র ৬ মাস। যুদ্ধে যাওয়ার সাত মাস পর যুহর বিশ্বাসের এক সহকর্মী আহত হন। যুহর বিশ্বাস তার সহকর্মীকে নিরাপদ রাখার জন্য তার বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন একজন রাজাকার তা দেখে ফেলে। রাজাকার পাকিস্তানি বাহিনীকে খবর দেয় যে, একজন মুক্তিযোদ্ধা তার বাড়িতে এসেছে। এ কথা শুনে পাকিস্তানিরা যুহর বিশ্বাসের বাড়ি হানা দেয়। এরপর তাকে ঘর থেকে ডেকে আনে। ডেকে আনার পর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার স্ত্রী সন্তানকে বাঁচানোর জন্য পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান বাবার বাড়িতে। আর আহত মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে ফিরে যান। তার কিছুদিন পরে দেশ স্বাধীন হয়। যুহর বিশ্বাস স্বাধীন দেশ দেখে যেতে পারলেন না।

সূত্র :জ-৫৪৬১

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রেজওয়ানা খানলাজ	**রিজিয়া বেগম**
বোয়ালমারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম: শিবপুর
৭ম শ্রেণি, রোল: ৮	সম্পর্ক: দাদি, বয়স: ৬৫

খবর পাওয়া যায়নি আজও

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকবাহিনী আধুনিক অস্ত্র নিয়ে কাপুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার ঘুমন্ত মানুষের উপর। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। এ দেশের অগনিত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। যখন যুদ্ধ শুরু হয়, আমি তখন ফরিদপুর জেলাধীন বোয়ালমারী এলাকায় আমার বাবার কর্মস্থলে লেখাপড়া করতাম। আমার গ্রামের বাড়ি ইতনা দৌলতপুরে। তখন হঠাৎ করে শুনতে পেলাম হানাদার বাহিনী ঢাকা আক্রমণ করেছে এবং গণহত্যা চালাচ্ছে। কিছু দিন পর খবর পেলাম যে, পাকবাহিনী বোয়ালমারী আক্রমণ করতে পারে। এজন্য আমরা প্রাণের ভয়ে বোয়ালমারী ছেড়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি দৌলতপুরে চলে গেলাম। কিন্তু সেখানেও রক্ষা পেলাম না। ১২ জুন আমাদের গ্রাম আক্রমণ করল পাকবাহিনী। গ্রামের এক অংশের কয়েকটি বাড়ি থেকে প্রায় দুই দিন অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ২৬ জন যুবককে তাদের ক্যাম্পে তুলে নিয়ে গেল। পরদিন অর্থাৎ ১৫ জুন ভোরে তাদের সকলকে মধুমতি নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে একে একে হত্যা করল এবং অনেক বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে গ্রামের সব লোক প্রাণ বাঁচাতে নানা নিরাপদ স্থানে চলে যেতে লাগল।

আমরা আমাদের পরিবারসহ আরো পনের জন রওনা হলাম কলকাতার পথে। কিছুদূর যাওয়ার পর যশোর জেলার বারোবাজার গ্রামের একটি রাস্তা পার হওয়ার সময় আমরা হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হলাম। তখন সেই স্থানেই আমাদের গ্রামের দুটি ছেলে মারা গেল। তাদের নাম মধু এবং অদু। আমরা দৌড়ে গিয়ে পাশের ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকলাম যাতে গুলি না লাগে। আমার মাথার প্রায় পাঁচ ছয় ইঞ্চি উঁচু দিয়ে একটি গুলি চলে গেল। সামনে অনেক লোকের বহর থাকায় তারা আমাদের দিক বিশেষ করে নজর দিতে পারেনি। কারণ তারা ছিল সংখ্যায় কম। আমরা তখন অন্য দিক দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম এবং আমাদের গ্রামের ঐ দুটি ছেলের লাশ সঙ্গে নিলাম। আমরা আবার আমাদের গ্রামের পথে অর্থাৎ ইতনা যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। কিছুদূর এগিয়ে গেলাম হঠাৎ চার পাঁচ জন রাজাকার আমাদের পথে বাঁধা দিল। তখন আমার বাবা কিছু টাকা এবং সোনা তাদের হাতে দিল এবং অনেক অনুরোধের পর তারা আমাদের ছাড়তে রাজি হল। এরপর আমরা আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছলাম।

ইতনা সরকারি প্রাইমারী স্কুলের মাঠে মধু এবং অদুর লাশ দাফন করা হলো। তখন আমাদের গ্রাম থেকে হানাদার বাহিনী ক্যাম্প উঠিয়ে নিয়েছে। আমরা বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় আমাদের এক বর্গাচাষী রহিম মোল্লাকে আমাদের বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য রেখে গিয়েছিলাম। গ্রামে ফিরে শুনি, আমরা যেদিন গ্রাম থেকে চলে যাই সেদিনই হানাদার বাহিনী আমাদের বাড়িতে আসে এবং কাউকে না পেয়ে রহিম মোল্লাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তার আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এভাবে আমাদের পরিবার অক্ষত অবস্থায় থাকলেও আমাদের গ্রামের প্রায় অর্ধেক মানুষকে মেরে ফেলে হানাদার বাহিনী। সে সময় নিখোঁজ হয় গ্রামের প্রায় অর্ধশতাধিক লোক যাদের কারো কারো লাশ পরে পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ লোকের কোনো খবর পাওয়া যায়নি আজও।

সংগ্রহকারী
ঝুম্পা হাজরা
বোয়ালমারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১০ম শ্রেণি, রোল: ৪

বর্ণনাকারী
প্রশান্ত কুমার হালদার
গ্রাম: ইতনা দৌলতপুর
পোস্ট: ইতনা, থানা: লোহাগড়া
জেলা: নড়াইল
বয়স: ৪৯, সম্পর্ক: বাবা

তুই নাকি মারা গেছিস

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল পাকহানাদার আমাদের ফরিদপুর জেলায় ঢুকে পড়ে। ১৮ এপ্রিল নগরকান্দা থানায় পাক বাহিনী আসে এবং নগরকান্দা নদীর ওপারে বহু গ্রাম ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তখন ঘোড়ামারা বিল নামক স্থানে তৎকালীন মেজর আর্জিত মোল্লা ও আলতাব এর নেতৃত্বে এবং আমাদের জনগণের সহায়তায় ২৮ জন পাক সেনা মারা পড়ে। এতে পাক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে পরের দিন ঘরবাড়ি জ্বালায় এবং যেখানে যে মানুষ পায় গুলি করে মারে। তালমার বিমল সাহা, নিখিল মালো, অনিল মালো এবং লস্করদিয়ার মোহাম্মদকে গুলি করে মারে।

২২ কিংবা ২৪ এপ্রিল হবে, আমি আমাদের বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখতে পাই আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক স্যার কয়েকজন বিহারিসহ বন্দুক, রাইফেল নিয়ে আমাকে ধরতে আসে। বুঝতে পেরে পাট ক্ষেতের ভিতরে লুকিয়ে থাকি। আমার মাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার ছেলে জলিল কোথায়? মা বলে, জানিনে বাবা। গালাগালি করে চলে যায়। পরে সন্ধ্যায় আমি মাকে বলে ভারতের উদ্দেশে রওনা হই। বহু কষ্ট করে, না খেয়ে পানি-কাদা-বৃষ্টিতে ভিজেও রাজাকারদের ধাওয়া খেয়ে ভারতে পৌঁছাই। ভারতে যাওয়ার সময় রাজাকার ও পাক বাহিনীর হাতে আমাদের সাথী দুইজন গুলি খেয়ে মারা যায়। আমাদের নেতা বর্তমান এম.পি কে.এম ওবায়দুর রহমানের নিকট কলকাতায় যেয়ে উঠি এবং সাজদা ক্যাম্পে ভর্তি হই। মেজর খালেদ আমাকে বলেন, তুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাই তুই ওবায়দুর ভাইয়ের কাছে যা। অভ্যর্থনা ক্যাম্প থেকে অস্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিব। আমি ওবায়দুর রহমানের নিকট প্রায় ১০/১২ দিন থাকি। পরে দেশে চলে আসি এবং আমার খালাত ভাই আ. হাসিদ জোমাদারের (যুদ্ধকালীন সময়) নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি। শীত-বৃষ্টি, রাত-দিন কষ্ট করে রাজাকারদের ও পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হই।

আমার মনে পড়ে, নভেম্বরের শেষ দিন নগরকান্দা থানা মুক্ত করলাম। ঠিক তারপর দিন পাকবাহিনী বহু সেনা নিয়ে আবার নগরকান্দা এসে গুলি চালায়। আমরা কয়েকটি দলে পাকহানাদারদের ফেরার পথে অ্যামবুশ করি এবং পজিশন নিয়ে থাকি। লস্করদিয়া গ্রামের রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের ভিতরে সংকেত ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার দল হতে গুলি শুরু করলে পাক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে শেল, মর্টার, ভারী অস্ত্র চালাতে থাকে। ঘোষবাড়ির ব্রিজের পাশে নাকড়া গাছের ঝোপের ভিতরে পজিশন নিয়ে থাকি। আমার সাথী দুইজন দুই পাশে প্রায় ২০ গজ দূরে দূরে। সকল মুক্তিযোদ্ধা ভয়ে পালিয়ে যায়। হঠাৎ দেখি পাক বাহিনী ব্রিজের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে

যায়। এই সময় আমি গুলি করি এবং একজন পাক সেনার বাম উরুতে গুলি বিদ্ধ হয় ও পড়ে যায়। তার হেলমেট ব্রিজের নিচে পড়ে যায়। আহত সেনাকে নিয়ে যায়। রাজাকাররা বলে, স্যার এটা রাইফেলের ফায়ার। তাদের কথা আমার কানে আসে। তখন আমি চুপ করে বসে থাকি। ওরা আমাকে ধরার জন্য বলাবলি করে। রাজাকাররা বলে, এদিকে নদী, যাওয়া যাবে না। আমি আলাহ্‌কে স্মরণ করি। দশরাউন্ড গুলি রাইফেল ভর্তি থাকা এবং আর এক রাউন্ড চেম্বারের ভিতর দিয়ে রাখি। আমার প্রতিজ্ঞা হল যে ১১ জন মারব পরে ধরা দিব, না হয় মরব। কিছু সময় পরে নীরব হয়ে যায় এবং পাকবাহিনী চলে যায় ফরিদপুরের দিকে। আমি ঝোপ হতে বের হয়ে ব্রিজের নিচে থাকা হেলমেট নিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা দেই। কয়েক গজ যাওয়ার পর দেখি আমার সহযোদ্ধা মোছলেম সরদারের ছেলে মেশিনগান ফেলে চলে গিয়েছে। আমি সেটি নিয়ে আমার নিজ বাড়িতে যাই। সন্ধ্যার পরে বাড়ি যেয়ে দেখি আমার মা আমার ছোট দুই ভাইকে নিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। এমন সময় আমি মাকে ডাক দেই। আমার মা আমাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। আমাকে ধরে বলে, বাবা তুই বেঁচে আছিস? আমি শুনেছি তুই নাকি মারা গেছিস। আমি বলি, মা শান্ত হও। আলাহ্‌ বাঁচিয়ে রেখেছে। কিছু সময় পর মার নিকট হতে দোওয়া নিয়ে ক্যাম্পের উদ্দেশে রওয়ানা দেই। এই সময় রাত্রি ৮টা হবে। ক্যাম্পে যেয়ে শুনছি কমান্ডার হামিদ বলছে, জলিল কোথায়? কেউ কেউ বলছে, জানি না। কেউ কেউ বলছে, ওতো জেদি লোক, হয়তো পাকহানাদারের শেল মর্টারে মারা গেছে। ঠিক এমন সময় সেই হেলমেট মাথায় পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে বলি, আমি মারা যাই নাই। তখন ক্যাম্পের সবাই অবাক হয় এবং বলে যে, এটা কোথায় পাইছিসরে জলিল? আমি বলি, পাকবাহিনী যখন ব্রিজের উপর আসে তখন গুলি করি এবং একজন পাক সেনা আহত হয়ে পড়ে যায়। সেই সময় তার হেলমেট ব্রিজের নীচে পড়ে যায়। পরে আমি নিয়ে আসি আর মোছলেমের অস্ত্র পথে পড়ে থাকা পাই। এটি আমার জীবনের একটি স্মরনীয় ঘটনা।

এরপর আমার জীবনের '৭১ সালের আর একটি ঘটনা ১৬ ডিসেম্বর যখন পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে ঠিক সেই দিন ভোররাত্রি আমরা ফরিদপুর পুলিশ লাইনে যাই। গিয়ে দেখি, পাক সেনারা পুলিশ লাইনের ভিতর অস্ত্র ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু সময় পর ভারতের সৈন্যরা আসে। তাদের নিকট অস্ত্র জমা দেয়। হঠাৎ মাইকের আওয়াজ কানে আসে যে প্রত্যেক দল হতে সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা পদ্মার পাড়ে চলে যাবে। তখন আমাদের দল হতে প্রায় ৩০/৪০ জন যাই। যাওয়ার পথে দেখতে পাই ট্রাকে বহু মুক্তিযোদ্ধার লাশ আসছে, পুলিশ লাইনের দিকে কিছু সময় পর মদনখালীর নিকট গেলে পজিশন নিতে হল। বিহারিরা পদ্মা নদীর ভাঙন হতে গুলি চালাচ্ছে। তাদের গুলিতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। আমরা ক্রলিং করতে করতে যুদ্ধে লিপ্ত হই। আমার ডান পাশে থাকা জহুরুল নামে আমার সহযোদ্ধা গুলি বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। এমন সময় তাকে পিছনের দিকে টেনে আমি এবং আমরা দুইজন সামনে অগ্রসর হতে থাকি। বহু গুলি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, মনে কোন ভয়ভীতি জাগে না। পরে বিকাল আনুমানিক ৫/৬ টায় বিহারিরা আত্মসমর্পণ করে।

বহু বিহারি তাদের নিজের অস্ত্রে আত্মহত্যা করে। ঐ দিন বহু মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। আল্লাহ আমার সহায় ছিল বলে আমি বেঁচে আছি। তা না হলে আমার ডানে থাকা জহুরুল মারা গেল, আমিওতো মারা যেতে পারতাম। পরে মাইকে আওয়াজ আসে আর কোন বিহারিকে মেরো না, ধরে নিয়ে আসো। তখন বহু বিহারি ধরে আনে পুলিশ লাইনে।

সূত্র : জ- ৫৩৪৮

সংগ্রহকারী
মো. মেহেদী হাসান (সেলিম)
লস্করদিয়া আতিকুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়
৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ০২

বর্ণনাকারী
মো. আব্দুল জলিল কমান্ডার মিয়া (মুক্তিযোদ্ধা)
গ্রাম: দক্ষিণ শাকপালদিয়া
বয়স: ৫৪ বছর